নব পর্য্যায়

কাজী আবদুল ওদুদ

১৩৩৩ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বদনেতে, চরিতে তোমার, হে মহান, হে নরগৌরব !
মরুভূমে মরুদ্যান, ভীমকান্ত দরশন তব,—উৎসারিত আত্মার সৌরভ !
যারা যত দীনহীন, অন্ধ, পঙ্গু, মূক, দিশাহারা, জন্ম তব তাহাদেরি ভিতে ;
জড়তায় রূঢ় স্পর্শ, অন্ধকারে বজ্রদীপ্তি তুমি,—জয় গাহে কবি মুগ্ধ চিতে !

যে তৌহীদ বিঘোষিলে তন্দ্রাহত জগতের কানে, বীর্য্যবান সে যে বীর্য্যবান ;
সমস্ত অন্তর মাঝে ফুৎকারিয়া দেঁয় অগ্নিকণা, কহে, "নাহি আল্লা ভিন্ন আন ;
"সে আল্লার ভাতি, সে ত নহে শুধু ধেয়ানীর চিতে, নহে শুধু ভকতেরে বুকে,
"জাগ্রত দেখহ তারে সর্ব্ব বর্ম্মে সর্ব্ব প্রেমে তব, সর্ব্ব ভয়ে, সর্ব্ব বন্ধ দুখে।"

* * * *

হে অমর'পয়গম্'-বহ, হে মহাতাপস, সঙ্কটবন্ধনোত্তির্ণ হে সৃষ্টির চিরদীপ্ত প্রাণ !
মহাকালকণ্ঠশোভী অম্লান রতন, প্রত্যয়বিগ্রহ মূর্ত্ত, কর কর তব ছন্দ দান।
মূঢ়, মূক, ন্যুব্জপৃষ্ঠ, নিরানন্দ, নির্ব্বীর্য্য, শ্রীহীন—সুন্দর এ পৃথ্বি বুকে
পুনঃ সেই শরণে তোমার :
বজ্র হানি কহ পুনঃ, "মিথ্যা কথা—অসম্ভব কথা !—আত্মা কভু নহে ক্ষুদ্র,
নহে দীন প্রকাশ তাহার।"

এই বইখানির "নব পর্য্যায়" নামকরণ করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, অধ্যাপক মৌলবী আবুল হুসেন, এম-এ, বি-এল।

ঢাকা

আষাঢ়, ১৩৩৩। কাজী আবদুল ওদুদ

সূচী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১	প্রতি পক্ষের	প্রতিপক্ষের
৮	২১	করছেন	করেছেন
১১	৮	জাগরণ-কামীতুর্ক জাতির	জাগরণ-কামী তুর্কজাতির
১১	১২	কার্য্যকরী হবে,	কার্য্যকরী হবে।
১৫	১১	কোনে	কোনো
৩১	১	ত	তা
৩৫	১৭	স্ফুরিত	স্ফুরিত
৪৬	১৭	প্রাণহীন তার	প্রাণহীনতার
৪৭	৩	পরিবেষ্টকে	পরিবেষ্টনকে
৫২	১৯	আসবাব পত্রে	আসবাব-পত্রে
৫৫	১৪	ব্রতী	ব্রততী
৫৫	১৫	উষর	উষর
৬৯	১৪	মানবমনেরজটিলতার	মানবমনের জটিলতা
৭৫	১৮	বিপর্য্যায়	বিপর্য্যয়
৭৭	২১	আলখাল্লায়	আলখাল্লায়

পদ্দাহীনতা, এবং তার এরকম আরো ছোট-খাটো 'অনৈস্লামি-

কতা'র ভিতর দিয়ে ক্রমে আমাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা শুরু হলো। যুগধর্ম্ম অর্থশূন্য নয়; আমাদের অশেষ গৌরব-আর আশা-ভরসা-স্থল কামালের এই সব অনাচার নীরবে সহ্য করে' যাওয়া হয়তো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হতো না। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! যাঁর হাতে আমাদের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার হবে বলে' আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করেছিলাম, তিনিই ভেঙে চুরমার করে' দিলেন আমাদের বহু স্বপ্ন বহু অশ্রু দিয়ে গড়া খেলাফত! শুধু তাই নয়; সমাজের শীর্ষস্থানীয়, যুগে যুগে পুঞ্জীভূত শাস্ত্রজ্ঞানের যাঁরা ভাণ্ডারী, সেই আলেমসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টি তা আদৌ শ্রদ্ধাবিনম্র নয়। আর তাঁর যোদ্ধার কঠোর হস্ত নিপতিত হয়েছে মুস্‌লিম নারীর সুপবিত্র, সুবিহিত, যুগযুগান্তরাগত, অবরোধের উপর!

—তবে রহস্য এইখানে যে, এ আফ্‌সোস শুধু এক-তরফাই নয়। হজরত মোহম্মদ তাঁর পয়গম্বরীর প্রারম্ভে তাঁর নিজের চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়ে কোরেশদের বলেছিলেন,—যাঁকে তাঁরা এতকাল ধরে' জানেন বিশ্বাসী, ইমানদার, 'আল-আমীন' বলে' তিনিই যখন আল্লাহ্‌র একত্ব প্রচার করছেন তখন কোন্ যুক্তিতে তাঁরা তাঁর সে কথা অবিশ্বাস করতে পারেন। হজরতের এই ব্যথিত প্রশ্নে কোরেশরা যে উত্তর দিয়েছিলেন, প্রাচীন পন্থীরা নবীন পন্থীদের চিরকাল সেই উত্তরই দিয়ে আস্‌ছেন। আদর্শের জন্য বড় নিষ্করুণ এ ভ্রাতৃবিরোধ। এর আঘাত দেহের উপরে যা লাগে, উভয় পক্ষেরই হৃদয়ের অন্তস্থলে লাগে তার চাইতে

অনেক বেশী নির্ম্মমভাবে। কিন্তু উপায় নাই। এই-ই বিশ্ববিধান। নব সত্যের প্রচারে, নব পর্য্যায়ের জীবনারম্ভে এই নির্ম্মমতার চিত্রই ইতিহাসের উপহার।

একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন পন্থী লোক বাস করে, আর কামাল আধুনিক কালের মুসলমান সমাজের নবীন পন্থীদের একজন বড় নেতা, নিশ্চয়ই এসব কথা সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন করে না। অতটুকু যুগধর্ম্ম কি আর আমাদের ভিতরে সঞ্চারিত হয় নাই! কিন্তু আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি তার প্রমাণ এইখানে যে, সমাজের এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, নবীন-প্রাচীনের দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করে', আমাদের সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি—অন্ততঃ যাঁদের বলবার মত কণ্ঠশক্তি, আর নিজেদের কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ ক'রবার মতো অর্থশক্তি, আছে—অন্তরে শুধু উদ্বেগ আর পীড়নই অনুভব করছেন ; যুগধর্ম্মের এই সব বিচিত্র চেষ্টার উদ্দেশ্যে তাঁদের আশীর্ব্বাদের হস্ত আদৌ উত্থিত হচ্ছে না বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। উল্টে' জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, জগতের মানব-সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশের পক্ষে একি খুব গৌরবের বিষয়? শিশুসুলভ এই পরিচিতের একান্ত মোহ আর কতকাল আমাদের পক্ষে প্রবলতমই হ'য়ে থাকবে? কতকালে আর আমাদের সমাজ-মনে যৌবনের সঞ্চার হবে, যার প্রভাবে বুঝতে পারা যাবে, ব্যক্তিগত জীবনের মতো সমাজ জীবনেরও ধর্ম্ম—পরিবর্ত্তন,—উদ্দেশ্য থেকে উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ, আদর্শ থেকে আদর্শে উন্নয়ন।

জানি, প্রতি পক্ষের এখানে একটি শক্ত জবাব আছে। তাঁর উক্তিতে দাঁড়াবে,—"আমাদের যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অথবা ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ, তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রয়েছে আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে। আর সে ধর্ম্মশাস্ত্র যে অপৌরুষেয়—Revealed. এরই পরিবর্ত্তন হবে না কি?"—সম্মানপুরঃসর প্রতিপক্ষকে নিবেদন করতে চাই,—হাঁ এই কথাটাও ভেবে দেখা দরকার। অন্যান্য দেশে বা সমাজে যাঁরা নব নব প্রয়োজনে জীবনরহস্যকে নব নব ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন শাস্ত্রের অপৌরুষেয়তার কি অর্থ তাঁদের সামনে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল হতে পারা খুব কষ্টসাধ্য নয়। ইয়োরোপীয় রিনেসাঁস, অথবা আমাদের অতি নিকটের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে বাঙালী হিন্দুর যে কিছু নব চৈতন্যলাভ, সেইটি প্রণিধান করলেও প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে নব পর্য্যায়ের জীবনের যে কি সম্পর্ক দাঁড়ায় তা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হবে।

এসব বাদ দিয়ে শুধু মুসলমানের অতীত ইতিহাস থেকেও স্পষ্টভাবে দেখানো যেতে পারে, মুসলমানের গৌরবের দিনে শাস্ত্রের একই ব্যাখ্যা তার ভিন্ন ভিন্ন যুগে চলে নাই। বর্ত্তমান কালে দুর্ভাগ্য বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের যে বিশ্বাসবানরা ধ্রুব নিশ্চয় করে' বসে' আছেন, মুসলমানের চরম কৃতিত্ব, হজরত তাঁর জামায় কি ধরণের বোতাম ব্যবহার করতেন, আর তাঁর আস্‌হাবরা কি ধরণে খাদ্য চর্ব্বণ করতেন, সেই সমস্ত তত্ত্বের

পুঙ্খানুপুঙ্খ উদ্ধারে, তাঁদের গণনার বাইরে রেখে এ সমস্ত কথা আলোচনা করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে। তাঁদের বাইরে আমাদের সমাজের যাঁরা শিক্ষিত, যাঁরা জিজ্ঞাসু, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, অন্যান্য জাতির বা দেশের ইতিহাসের মতো ইস্‌লামের ইতিহাসও শুধু একই আদর্শের অপ্রতিহত প্রবাহ নয়। বিভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সে ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্নরূপ না গ্রহণ করে পারে নাই। তাই হজরতের জীবিতাবস্থায় ও 'খোলাফায়ে রাশেদীন'এর প্রথম যুগে মুসলমানের জীবনে দেখতে পাই যে সবল ঋজুতা আর অনাড়ম্বর, তা থেকে দূরে পারস্য-প্রভাবান্বিত বনি-আব্বাসের যুগে দেখতে পাই, সেই ঋজুতার স্থানে দাঁড়িয়েছে জটিলতা, বহুভঙ্গিমতা, আর আড়ম্বরহীনতার স্থানে ফুটে উঠেছে ঐশ্বর্য্যের ও বিলাসিতার দীপ্তি। চিন্তা ও সৃষ্টির দিক দিয়ে মোতাজেলাদের যুগ, সুফীদের যুগ, আর ভারতীয় আকবর-শাহ্‌জাহানদের যুগ, এমনি বিভিন্ন আদর্শাবলম্বী, বিভিন্নরূপী।

মুসলমান ইতিহাসের স্তরে স্তরে এইভাবে একটানা বৈচিত্র্যহীনতাই যে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না তা মুসলমানের মন্দ ভাগ্যের জন্যও নয়, শক্তিহীনতার জন্যও নয়; এই বৈচিত্র্য-বিপুলতাই মানব প্রকৃতির জন্য সত্য। কথাটাকে অন্য ভাবেও বলা যেতে পারে। হজরত ওমর আর হারুণ-অর-রশীদ উভয়েই ছিলেন খলিফা ;, কিন্তু একজনের "এক্‌তারী" ছিল চারটী ছোলা, আর-একজনের বাবুর্চ্চিখানার দৈনিক খরচ ছিল দশহাজার

দিরূহাম। অথচ হারুণ-অর-রশীদকে মুসলমান ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া চলে না, বাদ দিলে মুসলমানের গৌরবসৌধের এক বিরাট স্তম্ভই ভূমিসাৎ হয়ে' যায়। তেমনিভাবে ইব্‌নেরোশ্‌দ্‌ আর ইমাম গাজ্জালী তুজনেই মহাপণ্ডিত মুসলমান; কিন্তু একজনের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তি বিচার, আর একজন শাস্ত্রানুগত্যকে শ্রেয়োলাভের এক বড় পথ বলেই জানেন। ইত্যাকার বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে—যেমন বীরকেশরী ইব্‌নে জুবের আর বীরকেশরী বাবর, বাদশাহ নাসিরুদ্দিন আর বাদশাহ শাহজাহান, কবি সাদী আর কবি হাফেজ—যাঁদের স্বাতন্ত্র্যের ভঙ্গিমা দেখে দৃষ্টিমান মাত্রেরই মনে পড়বে, চিররহস্যময় মনুষ্যজীবন দৃশ্যতঃ একই আদর্শের কিরণসম্পাতে বর্দ্ধিত হয়েও কত রকমারি বৈচিত্র্যেই না অনুরঞ্জিত হয়—নয়নাভিরাম হয়!

বাস্তবিক, যে-কোনো তত্ত্বের চাইতে, যে-কোন আদর্শের চাইতে মানব-প্রকৃতি গভীরতর, জটিলতর। যুগে যুগের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ আর ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ধারায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ কারাতেই তার সার্থকতা।—এসব জ্ঞানের একেবারে গোড়ার কথা। এসব না বোঝা, আর জ্ঞানের দিকে একেবারে পিঠ ফিরিয়ে জীবন আরম্ভ করা, এক কথা। সমাজের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে যদি না মানা যায়, তবে সমাজ যে মানুষের বাস আর পরিবর্দ্ধনের জন্য অযোগ্যই হয়ে দাঁড়ায়, একথা অস্বীকার করবার মতো স্পর্দ্ধা কেবল তিনিই দেখাতে পারেন, স্পর্দ্ধা ভিন্ন অন্য সম্বল লাভ যাঁর পক্ষে জীবনে সম্ভবপর হয় নাই।

মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

প্রত্যেক সমাজে যে বৈচিত্র-বিলাসী মানুষ বাস করে, শুধু বিশেষ বিশেষ আদর্শের, মতবাদের, ডগ্‌মার, লীলাক্ষেত্রই মানুষের সমাজ নয়; আর সেই মানুষ জন্তুধর্ম্মী, অর্থাৎ জন্তুর মতো ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায় অধীর, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভিলাষী; এ সমস্ত কথা ভুলে থাকা আর কোনোমতেই আমাদের শোভা পায় না। মানুষের যে জাগতিক জীবন, এই জাগতিক জীবন যদি সুন্দর না হয়, সুব্যবস্থিত না হয়, তবে সত্যকার নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, তার পক্ষে সুদূরপরাহতই হ'য়ে থাকে। সুপক্ক ফল যেমন বিস্তারিত নৈসর্গিক ক্রিয়ার পারম্পর্য্যের অপেক্ষা রাখে, ওটি একটা বিপুল চেষ্টার পরিণত অবস্থা, তার খণ্ডতা নয়, তেমনিভাবে ভাব, জ্ঞান, আর অর্থসমৃদ্ধ, জাগতিক জীবনেরই অপরিহার্য্য পরিণতি দাঁড়ায় নৈতিকতায়, আধ্যাত্মিকতায়। শুধু অনুকরণ, শুধু পূর্ব্বানুবর্ত্তিতা সত্যকার আধ্যাত্মিকতা-লাভের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ—অর্থহীন। এর জন্য প্রয়োজনীয় একটা বলিষ্ঠ, ঘাতসহ, মানব-প্রকৃতি, সুব্যবস্থিত জাগতিক জীবনের উপরই যার ভিত্তি-পত্তন সম্ভবপর।

মুস্তফা কামালের প্রশংসায় আজ আমরা যে প্রবৃত্ত হয়েছি, তার কারণ সমগ্র মুসলমান জগতের বহুবিস্তৃত জীবন্মৃততার মাঝখানে তিনিই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই সুন্দর জাগতিক জীবনের তত্ত্ব নূতন করে' উপলব্ধি করেছেন—শুধু উপলব্ধি নয়, তাঁর সে উপলব্ধিকে নানা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলে' এর অমৃত রস তাঁর স্বদেশীয়দের অন্তরেও পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

কি পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করে' তিনি নবসৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা ভাবলে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না। প্যান-ইসলাম তত্ত্বকে যে সমগ্র মুসলমানজগত সাদরে বরণ করে নিয়েছেন, সে শুধু ধর্ম্মপ্রীতির জন্যই নয়। বর্ত্তমান জগতে মুসলমানের যে স্থান লাভ হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে, তা অগৌরবের। এই হীনতাপঙ্কে সে যাতে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে না যায় এই জন্যও তার এই সঙ্ঘবদ্ধতার এত উৎসাহ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্যান-ইসলামের তথাকথিত সঙ্ঘবদ্ধতা কি মুসলমানের দুর্ব্বলতাকেই লালন করে' চলে নাই? ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাদের সত্যকার অবস্থা কি, কি উপায় অবলম্বন করলে পুনরায় তারা শক্তিমান হয়ে' সম্মানিত জীবন যাপন করতে পারবে, এ সবের দিকে এই সঙ্ঘবদ্ধতা তাদের দৃষ্টিকে কি অন্ধ করেই রাখে নাই? অথচ উদ্ধারের পথও এখানে কম সঙ্কটসঙ্কুল নয়। এই পরম হীনতাপঙ্কে দাঁড়িয়ে, দৃশ্যতঃ এই একমাত্র অবলম্বনকেও বিসর্জ্জন দিয়ে, একেবারে গোড়া থেকে নবসৃষ্টির কাজে লাগা!—বীরের যোগ্য এ কর্ম্ম!—পরম আত্মপ্রতিষ্ঠ দৃষ্টিমানের যোগ্য এ কর্ম্ম! বাস্তবিক আধুনিক মুসলমানের জন্য অতি অপ্রোয়জনীয় এবং সমাজনীতি ও রাজনীতির দিক দিয়ে অতি অনিষ্টকর এই খেলাফত-জঞ্জাল সবলে দূর করে' দিয়ে মুসলমানের ইতিহাসে, তথা মানুষের ইতিহাসে, কি অসাধারণ বীররূপে কামাল যে নিজেকে পরিচিত করছেন, পরবর্ত্তীকালের ঐতিহাসিক তার মহিমা শতমুখে ঘোষণা করেও তৃপ্তি পাবেন না।

মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

নানা-সংস্কার-জর্জ্জরিত হীন ক্ষীণ তামসিক জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তে এই যে তিনি প্রচলিত করলেন সর্ব্বপ্রকারে-সমৃদ্ধ, সুন্দর, সবল, জাগতিক জীবন, জীবনের উপর প্রাচীন শাস্ত্রের সর্ব্বময়কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করে' তার স্থানে এই যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন মানববুদ্ধির অধীশ্বরত্ব, মুসলমানসমাজে সত্যকার আধ্যাত্মিক জীবনের স্থায়িত্ব আর পরিব্যাপ্তি এরই থেকে ভবিষ্যতে সম্ভবপর হবে।

এ সম্বন্ধে কামালের নিজের উক্তি অল্পদিন হলো খবরের কাগজে বেরিয়েছিল, তার সারমর্ম্ম এই :—Pan-Islamism, Pan-Turanianism ইত্যাদি বহু নিষ্ফল স্বপ্ন মুসলমানরা এতদিন দেখে এসেছেন ; তাতে মুসলমানজগতের লাভ কিছুই হয়নি, বরং লোকসান হয়েছে অনেক বেশী। এই সমস্ত কথায় ভীত হয়ে মুসলমানের বিপক্ষ দল তাঁদের সকল চেষ্টাকেই আঁতুড়ে গলা টিপে মারতে তৎপর হয়েছেন। তা ছাড়া, এত বৈচিত্র্যপূর্ণ সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্যকরূপে পরিচালনের ক্ষমতা যে আধুনিক মুসলমানের নাই, এই অত্যন্ত সত্য কথা তাঁরা নিজেরা সহজভাবে স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ হয়েছেন। কিন্তু আর এই সব দুঃস্বপ্ন দেখে' কোনো লাভই নাই। এখনকার সত্যকার প্রয়োজন, মুসলমান যে যেখানে আছেন তাঁদের প্রকৃত অবস্থা কি, কিসে তাঁদের দুঃখদৈন্যের অবসান হবে, পুনরায় কেমন করে' তাঁরা উন্নত হবেন, এই সমস্ত বিষয়েই পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া। —কামাল নিজে তাঁর সাধনার বিষয় করে' তুলেছেন তুর্ক জাতির

পুনর্গঠন। স্বাধীনতায়, ধনে, মানে, জ্ঞানে, সুরুচিতে, মনুষ্যত্বে তুর্কজাতি যাতে সত্যকার মনুষ্যজাতি হয়ে গড়ে' উঠতে পারে— শক্তিমান মানুষের প্রাণ আর মস্তিষ্ক নিয়ে নিজেদের প্রাচীন ধর্ম্মাদর্শের, ও অন্যান্য জাতি ও সভ্যতার আদর্শের, মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারে, বুঝতে পারা যাচ্ছে, এই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার বিষয়। এত দূর থেকে তাঁর অনেক কাজকে মনে হ'তে পারে শুধু ইয়োরোপের অন্ধ অনুকরণ। কিন্তু যিনি রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান নায়ক হয়েও কৃষক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অনাড়ম্বর, দেশের সর্ব্বত্র নানা সমিতি-অনুষ্ঠান ছড়িয়ে দিয়ে ধীরভাবে পুনর্গঠনের কার্য্যে ব্যাপৃত, মুসলমান জগতের যুগ-সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান সেই অসাধারণ শিল্পীকে শুধু অনুকারক বলতে যাওয়া দুঃসাহস আর নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে। তা ছাড়া সমাজ জীবনে যে বৈচিত্র্যের কথা আগে বলা হয়েছে সে কথা এখানে স্মরণ করা দরকার। যাঁদের সঙ্গে তুর্ক জাতির দৈনন্দিন কারবার তাঁদের প্রভাব ও প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে তুর্ক মুসলমানের জাতীয় জীবন যে-রূপ পরিগ্রহ করবে, ভিন্ন-পরিবেষ্টনে-বর্দ্ধিত ভারতীয় মুসলমানের রুচি-অরুচির সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য তো নিশ্চয়ই অপরিহার্য্য। সামান্য চিন্তাশীলের পক্ষেও সে কথা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়।

অবশ্য কোনো দুর্ব্বলতাই যে কামালের ভিতরে সম্ভবপর নয়, একথা বলবার মতো স্পর্দ্ধা আমাদের নাই—এর প্রয়োজনই কি আছে? তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মে তাঁর বহু দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেতেও

পারে। এমনও হতে পারে, অস্থায়ী জননায়কের আসন ছেড়ে হয়ত শেষে নেপোলিয়ানের মতো রাজাসনের জন্য তাঁর মনে লোভ জন্মাবে। এ আশঙ্কা বেদনাদায়ক বটে; কিন্তু সত্যই খুব আফ্‌সোসের নয়। কামাল মুসলমান সমাজের নব-জীবনারম্ভের এক চমৎকার পূর্ব্ব সূচনা, সভ্যজগতে হৃতশ্রী মুসলমানের জন্য বিধাতার হাতের এক স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর কর্ম্মধারায়,—এই কথাটাই এখন আমাদের গভীর চিন্তার বিষয়ীভূত হোক। নবজাগরণ-কামীতুর্ক জাতির সমাজ-জীবনে যে-রূপ দান করতে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন, নবজাগরণ-কামী ভারত বা বাংলার মুসলমান তাঁর সমাজ জীবনে হয়তো হুবহু সেই-রূপেরই প্রতিষ্ঠা করবেন না, ভিন্ন পরিবেষ্টন এখানে কার্য্যকরী হবে, কিন্তু কামালের কাছ থেকে এই-ই আমাদের প্রধান গ্রহণের বিষয় যে, অতীতের অন্ধ অনুবর্ত্তিতায় নব সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। নব জাগরণ যিনি চান, অতীতকে কিছু রূপান্তরিত করে' না নিয়ে তাঁর উপায় নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রে কামালের যে নব আবিষ্কার—বড় বড় দুঃস্বপ্ন দেখারি চাইতে সত্যকার ছোট কাজ অনেক বেশী মূল্যবান, সেই সত্য আমাদের দুঃস্থ সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ুক। চারদিকে আমাদের হীনতা, নিরক্ষরতা, আর তার চাইতেও শোচনীয়, তথাকথিত সমাজ-নেতৃবৃন্দের বিচারমূঢ়তা, দৃষ্টিহীনতা—যার ফলে দারিদ্র্য আর পশুত্ব আমাদের সমাজে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে' বসেছে;—সেই সত্যকার ক্ষত-স্থান-সমূহে আমরা

এ পর্য্যন্ত কতটুকু সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছি? এমন কি, সেই সমস্ত স্থানেই কর্ম্মীর যে সব-চাইতে বড় প্রয়োজন, সেই বোধই যেন আমাদের ভিতরে নিঃসাড় হয়ে আছে। আমাদের যে-টুকু সামর্থ্য, যে-টুকু সঞ্চয়, পথে-বিপথে খেয়ালী খরচে তা উৎসন্ন হ'য়ে যাচ্ছে!

কিন্তু সত্যের আঘাত বড় প্রচণ্ড। মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গতানুগতিকতাকে ধূলিসাৎ করে' দিয়ে, নব সৃষ্টির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখিয়ে, মুসলমান সমাজের বুকে কামাল যে সত্যকার আঘাত দিয়েছেন, আশা করা যায়, এই আঘাতেই আমাদের শতাব্দীর মোহ-নিদ্রার অবসান হবে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জাতীয়তায়, সাহিত্যে, সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের ভিতরে স্থান পেয়েছে যে জড়তা, দৃষ্টিহীনতা, মনে আশা জাগছে, যেমন করেই হোক, এইবার তার অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। কামালের প্রদত্ত এই আঘাতের বেদনাতেই হয়তো আমরা উপলব্ধি করতে পারবো—সত্যকার ধর্ম্মজীবন কি, জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রের সত্যকার সম্বন্ধ কি। হয়তো আরো উপলব্ধি করতে পারবো, জীবন-সমস্যার চরম সমাধান কোনো কালেই হ'য়ে যায় নাই, নূতন ক'রে সে সমস্ত বিষয়ে সচেতন হওয়া আর তার মীমাংসা করতে চেষ্টা করা—এই-ই জীবন।

আর, এই বেদনাময়, আনন্দময়, উপলব্ধির বহুভঙ্গিমচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হবে আমাদের যে আত্মপ্রকাশচেষ্টা, তারই থেকে উৎসারিত হবে আমাদের সত্যকার সাহিত্য।

১৩৩২ সালের পৌষ মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে ও ঢাকা মুস্‌লিম হলে পঠিত।

সাহিত্যে সমস্যা

সাহিত্যে সমস্যা *

মস্ত নাম দিয়ে লেখাটির আরম্ভ হলো। কিন্তু শ্রোতৃবর্গ অসহিষ্ণু হবেন না, Realism, Idealism, জাতীয়তা, সার্ব্বজনীনতা, সত্য-শিব-সুন্দরের সমন্বয়, ইত্যাদি নামধেয় ভীতিপ্রদ সাহিত্যিক সমস্যার অবতারণা করে' আপনাদের অতিষ্ঠ করে' তুলবার মতলব আমার নয়।

যে কথাটা বলতে চাই তা বরং কতকটা এর উল্টো। অল্প কথায় বললে তা দাঁড়ায়—সাহিত্যে বাস্তবিকই এ সমস্ত সমস্যা নাই। সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁদের দিক থেকে দেখ্‌লে সমালোচক-দের এই সব সমালোচনার কারসাজি কতকটা ডন্‌কুইক্‌সোটিক্‌ ব্যাপার বলেই মনে হয়।

এ কোনে নতুন কথা নয়। প্রায় কবিই এই নিয়ে দিঙ্‌নাগের বংশধরদের ঠাট্টা করে এসেছেন। তবে পুরোণো কথা হলেও পুনরুক্তিতে এর সত্য যে খুবই ম্লান বোধ হবে তা মনে হয় না।

ইমার্সন বলেছেন, মহা মানব এমন সমস্ত কথার অবতারণা করেন যে-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-বাদ করবার ক্ষমতাও তাঁর যুগের লোকের নাই। যথেষ্ট ভাববার বিষয় আছে তাঁর এই উক্তিতে। এর এক বর্ণও কি মিথ্যা? দূরে যাবার দরকার করে না, বাংলার

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে পঠিত।

কাব্যে ও ছন্দে মধুসূদন যে সমাধান করে' গেলেন তাঁর, যুগের কজন বাঙালী তার সম্ভাব্যতাও কল্পনা করতে পেরেছিলেন ?—তেম্‌নি করে' বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকার পূজা, নির্জ্জীব বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক বাঙালীর জীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব শিল্প-চাতুর্য্য, এ সমস্তের কতটুকু আমরা, তাঁদের দেশবাসী, আজও বুঝে উঠ্‌তে পেরেছি ? ফেরদৌসীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে একজন উর্দ্দু-সাহিত্যিক চমৎকার বলেছেন—ফার্‌সী ছিল শিশু, আধো আধো তার বোল, পলকে সেই হয়ে উঠ্‌ল জওয়ান ! আর সে জওয়ানীও যে-সে জওয়ানী নয়—রোস্তমের পাহলোয়ানীর যোগ্য !

এই যে বিশেষ-ক্ষমতা-সমন্বিত প্রতিভা, মূককে যা বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করায়, তা কখন, আর কেন, বিশেষ কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিতরে আবির্ভূত হয়, আজও আমরা বল্‌তে বাধ্য, তার সব কারণ আমরা জানি নে। ইতিহাসে মোটের উপর দেখ্‌তে পাই এর কার্য্য ; আর অনেক সময় দেখা যায়, যে মূর্ত্তিতে প্রতিভা নরসমাজে আবির্ভূত হলো তা কতকটা অপ্রত্যাশিত, অথবা অবাঞ্ছিত। ইহুদীরা প্রতীক্ষা করছিলেন এক প্রতিবিধিৎসু পরিত্রাতার আগমন, এলেন সেখানে প্রেম-মূর্ত্তি যীশু। পৌত্তলিক নৃশংস আরব সমাজে একেশ্বর-তত্ত্ব যে একেবারে অবিদিত ছিল, তা নয় ; কিন্তু যে অমিত-তেজ-সম্পন্ন একেশ্বরবাদ, আর নৈতিক জীবনের আদর্শ, নিয়ে আবির্ভূত হলেন মোহম্মদ, সাধারণ আরবীর পক্ষে তা এতই অবাঞ্ছিত যে ব্যক্তিগত ভাবে অকথ্য অত্যাচার সারাজীবন তাঁকে ত সহ্য

কর্‌তে হয়েছেই, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জ্ঞাতি কোরেশকুলের অধিকাংশ ব্যক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত সে তত্ত্ব বুঝেই উঠতে পারে নাই।

এঁদের তুলনায় সাহিত্য-রথীদের শক্তি কিছু হীনপ্রভ মনে হতে পারে; কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায়, সমস্ত রকমের প্রতিভাই এক গোত্রের,—"অঘটনঘটনপটীয়সী" এই তার চির-কালের বিশেষণ।

এহেন শক্তির যিনি অধিকারী, সামান্যমস্তিষ্কসমন্বিত পাণ্ডিত্যাভিমানীর তাঁরই গতিপথ নির্দ্দেশ করবার, নিয়ন্ত্রিত করবার, যে দুরাশা তাকে স্পর্দ্ধা ভিন্ন আর কোনো ভদ্র নামে অভিহিত করা যায় না। অলঙ্কার আর ব্যাকরণ-সূত্রের জঞ্জাল জমিয়ে সাহিত্য-রথীর গতিপথে বিঘ্ন উৎপাদন যে হাস্যকর, আজকাল একথা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এখন আমাদের মনের প্রধান মোহ—প্রচলিত নীতিরুচির মোহ,—সংস্কারের মোহ। বলছি না, আমাদের যে সমস্ত সংস্কার তা অর্থহীন কেবলই মিথ্যা। তবে আমাদের সংস্কারের বাইরেও যে অনেক কিছু সুন্দর, অনেক কিছু মঙ্গলকর, থাকতে পারে সে খেয়াল আমাদের নাই, বা থাকলেও তা নির্জ্জীব, অকর্ম্মণ্য। তাই বলছি আমাদের এ মোহাচ্ছন্ন অবস্থা।

এক জগদ্‌বিখ্যাত ব্যক্তির এই কথাকে মহামূল্য বলেই মানি—'A healthy nature cannot be immoral. প্রতিভার ভিতরে এই স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান; এর মগ্নচৈতন্যে সত্য-শিব-সুন্দরের এক চমৎকার সমন্বয় আপনা থেকে হয় বলেই এর এই

স্বাস্থ্য আর শক্তি। তাই প্রতিভার হাতে ধ্বংস খুবই হয়; প্রলয়ও সে ঘটায়; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়ে আসছে—সেই ধ্বংস আর প্রলয়েরই স্তরে স্তরে বিরাজমান মঙ্গল। —সীতা-সাবিত্রীর বা এ কালের সূর্য্যমুখীর আসনে আজ যদি উপবিষ্ট দেখি দামিনীকে, মঞ্জলক্ষ্মীকে, তার জন্য অস্বস্তি-আফ্সোসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেননা এ সমস্ত এক নব পর্য্যায়ের মঙ্গল মূর্ত্তি—নব নব পথে প্রবহমান জীবনের নব নব আবিষ্কার।

কথা হতে পারে, প্রতিভাবান যা দেবেন তা কি কেবলই যুক্তকরে অবনতমস্তকে গ্রহণ করতে হবে? মনে যার প্রত্যয় জন্মে না সে কি আপত্তি জানাবে না? প্রতিবাদ করবে না?—নিশ্চয়ই করবে। কোনো বিশেষ প্রতিভাবান যা দিলেন তাই যে সত্যের একমাত্র রূপ এত বড় স্পর্দ্ধার কথা কি কেউ বলতে পারে? প্রতিবাদও অনেক সময়ে এক নব পর্য্যায়ের সৃষ্টির পূর্ব্বাভাস। এখানে শুধু এই কথাটুকু বল্‌তে চাচ্ছি যে, শক্তিমানের প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমরা না হারাই। তাঁর কথায় অর্থ আছে, সৃষ্টিতে নব মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, মানুষের চিরনবীনতার তিনি এক নূতন প্রমাণ—এ কথা যেন আমরা না ভুলি।

বাস্তবিক প্রতিভার সৃষ্টিতে যে অপূর্ব্বতা, তা ভাবলে চমৎকৃত না হয়ে থাকা যায় না,—চিরকালই মানুষ এতে চমৎকৃত হয়ে এসেছে! আর তার এমনি প্রভাব যে প্রচলিত নীতিরুচির মায়াকান্না তার সামনে যেন বেত্রাহত হয়েই স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভিকৃটর হিউগোর জিন ভালজিনের সামনে "সদ্বংশ ক্ষত্রিয়োবাপি

ধীরোদাত্ত গুণান্বিত"-এর সংকীর্ণ অর্থ চিরদিনের জন্য হেঁটমাথা হয়ে যায় নাই কি ?

প্রতিভাবানের সৃষ্টির উপকরণও যে কোথা থেকে কি উপায়ে সংগৃহীত হয় সে ব্যাপারটিও কম বিস্ময়কর নয়। পুরোপুরিই তিনি দেশকালের সন্তান ; কিন্তু সে দেশ শুধু তাঁর স্বদেশই নয়, আর সে কাল শুধু তাঁর সমসাময়িক কালই নয়। রামমোহনের দেশ বঙ্গের এক প্রান্ত, আর কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। অথচ তাঁর দেশবাসী হারির মা পারীর মা বড়াই বুড়ি রামনাথ তর্ক-পঞ্চাননই নয় ; আর তাঁর মনোধর্ম্মের বিশিষ্টতার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মত বৈদিক যুগ, ঔপনিষদ্ যুগ আর মোতাজেলাদের যুগও তাঁর পক্ষে জীবন্ত। গুরু- বা মনীষী-পারম্পর্য্যও প্রতিভা-বানের পক্ষে বন্ধন নয়। বঙ্গ সাহিত্যের আসরে নবীনচন্দ্রের সহজ তুম্‌তানানানা শেষ হতে না হতেই কে আশা করেছিল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উঠ্‌বে এমন অপরূপ তাল-মান-সমন্বিত গীতঝঙ্কার !

প্রতিভাবান যে Infallible নন, অসম্পূর্ণতা ত্রুটী তাঁতেও আছে, তার ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে শক্তিমান, সত্যের এক চমৎকার রূপ উপলব্ধি করা যায় তাঁর ভিতরে, এইটিই আসল গণনার বিষয়। সেই পরম কৌতুকীর এ এক চমৎকার কৌতুক যে অক্ষম অথচ দুরাকাঙ্ক্ষ মানুষকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে তিনি বাঁদর নাচের তামাসা দেখছেন। শক্তিমানের নাকেও যে সময় সময় সে দড়ি না ওঠে তা নয়। কিন্তু তা নিয়ে

ব্যস্ত হবার কি দরকার আছে? মানুষের অধিনায়কত্বে, বিশেষ করে সাহিত্যে, কোনো দিন অনধিকারীর আসন লাভ ঘটে না, জয় পত্র ললাটে বেঁধে যিনি মানুষের সামনে দেখা দিলেন স্বয়ং বিধাতার দেওয়া সেই জয়পত্র—এ সব আমরা জানি, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এই মোটা কথাটাও জানি যে, সেই জয়পত্রের মেয়াদের কম-বেশ আছে।

ফাল্গুনীর যৌবনের দল গাচ্ছেন—"চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে।" জীবনে, সাহিত্যে, সত্যকার সমস্যা যদি কোথাও থাকে তবে সে এই গতির সমস্যা—পর্য্যাপ্ত জীবনানন্দ আর অপ্রতিহত চলার বেগের সমস্যা। বলা যেতে পারে, এই গতির অভিমুখেই তো Realism Idealism-এর সমস্যা, জাতীয়তা সার্ব্বজনীনতা সত্যশিবসুন্দরের সমন্বয় ইত্যাদির আলোচনা। —কিন্তু এ বৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে শুধু কূঁয়োর জল টেনে টেনে সমস্ত দেশকে সজীব রাখবার চেষ্টা, তাই চিরকাল বর্ষণধর্ম্মী স্রষ্টাদের কাছে হাসি তামাসার ব্যাপার।

বাস্তবিক বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট হয়ে যায় নাই, অতীত সংস্কারের জুজুর ভয়ে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যেখানে ক্ষীণ কাহিল হয়ে পড়ে নাই, সমস্যা নিয়ে কোনো সমস্যাই সেখানে নাই। নানা সমস্যার আলোচনা সেখানে চলতে পারে, কিন্তু সে-সব খেয়ালের নামান্তর।

সমস্যা যাতে "জীবন"রাজের দরবারে মোসাহেবী করতে পারে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার স্পর্দ্ধা না রাখে, যদি কোনো দিকে দৃষ্টি রাখবার দরকার করে তবে সেই দিকে।

"মানব-মুকুট"

"মানব-মুকুট"

(আলোচনা)

(১)

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত মানব-মুকুট বইখানা বছর দুয়েক হলো ছাপা হয়েছে—লেখা হয়েছে এর বহু আগে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্য দুই-ছত্রী সমালোচনার কথা বলছি নে; বইখানি চটি হলেও সেই দুই-ছত্রী সমালোচনার যোগ্য নয়।

শুনেছি, হজরত মোহম্মদের একখানি বড় জীবনী লিখবার সংকল্প চৌধুরী সাহেবের আছে। স্বাস্থ্যহীনতা ও অন্যান্য নানা কারণে তা পেরে উঠচেন না, বা তার প্রকাশে দেরী হচ্ছে। তাই তার ভূমিকা-স্বরূপ-লেখা এই প্রবন্ধটি তিনি আগেই ছেপে দিয়েছেন।

কাজেই এটি হজরত মোহম্মদের পুরোপুরি জীবনী নয়—জীবনী-পাঠ, অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার আলোচনা। কিন্তু এই অল্প পরিসরে ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা তাঁর কলমের মুখে বেরিয়েছে যা বাংলার মুস্‌লিম সমাজের কাছে এক অতি বড় সুসংবাদ—অন্ততঃ মুসলমানের নব জাগরণের

প্রতীক্ষায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের চোখে এ এক চমৎকার পূর্ব্ব-সূচনা।

সাহিত্য জীবন্ত মনের প্রকাশ। আমাদের জাতীয় মন জীবন্ত তো নয়ই, ঝিমন্ত কি না তাও সন্দেহ। এ অবস্থায় আমাদের সৃষ্ট সাহিত্য যে সাহিত্য নামের অযোগ্য হবে, এ খুবই স্বাভাবিক। হজরত মোহম্মদের জীবনচরিতও আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু শুষ্ক আর অর্থহীন ঘটনাবিন্যাস ভিন্ন আর কিছু কি তাতে সম্ভবপর ? কি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা, কিসে আমাদের মঙ্গল, এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব যাদের ভিতরে এত বেশী, তারা কোথায় পাবে সেই ধ্যানীর দৃষ্টি যাতেই কেবল প্রতিভাত হতে পারে হজরত মোহম্মদের মতো ইতিহাসের এক বিরাট পুরুষের শক্তি-মাহাত্ম্য ! ইতালীয় দার্শনিক মহামতি ক্রোস্ বড় সুন্দর বলেছেন—'বর্ত্তমান ইতিহাস ভিন্ন মানুষের আর কোনো ইতিহাস নাই'। অতীত ইতিহাস তখনই তার পক্ষে অর্থ-পূর্ণ ইতিহাস, যখন বর্ত্তমানের জীবন-সমস্যার সমাধানের সহায়রূপে তা এসে দাঁড়ায়। সেই বর্ত্তমানে মূঢ়ের মত শুধু ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে আমরা চেয়ে রয়েছি জগতের পানে। অতীত তাই আমাদের পক্ষে অস্তমিত—শুধু অন্ধকার।

কিন্তু আল্লাহ্‌র করুণা অসীম। এই অবজ্ঞাত বাংলার মুসলমানও হয়ত শুধু খেয়ে-পরে বংশ-বৃদ্ধি করে' ধ্বংস হয়ে যাবে না ! বহু আঘাতের পর তার যে ঈষৎ চৈতন্যের সঞ্চার হয়েছে, তার স্পন্দন আকাশে-বাতাসে অনুভব করা যায়।

(২)

একালের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে দুই জন তাপসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি—মোহম্মদ লুৎফর রহমান, আর মোহম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী। কিসে জাতির মঙ্গল হবে, সে সমস্যা নিয়ে এঁরা কম সাধনা করেন নি; তার প্রমাণ রয়েছে এঁদের রচনায়। পর্য্যাপ্ত সৃষ্টি ক্ষমতা থাকলে হয়তো এঁদের দ্বারাই মুসলমান সমাজে যুগান্তর সূচিত হতো।

আগেই বলা হয়েছে, এয়াকুব আলী সাহেবের এই চটি বইখানি হজরত মোহম্মদের পূরো জীবনী নয়—জীবনী পাঠ। কিন্তু বাস্তবিকই এ একটা পাঠ। অর্থাৎ, একজন জীবন্ত আধুনিক যুগের পুরুষ পাঠ করতে চেষ্টা করেছেন হজরত মোহম্মদের মহাজীবন।

'জীবন্ত' আর 'আধুনিক' এই দুটি কথার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জীবন্ত তাকেই বলি যে সাড়া দেয়, প্রতিদিনের ক্ষয় পূরণ করে' যে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু মানুষের বাঁচা শুধু খেয়ে-পরে বাঁচাই নয়। মন বলে' তার ভিতরে একটি উপসর্গ আছে, তাকে লালন করবার দায় তাকে পোহাতে হয়। জীবনের উন্নতি, অবনতি, ভাল, মন্দ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, ইত্যাদি সব ব্যাপারেই সর্দারি করে এই মন। তাই মন যদি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে জীবনযুদ্ধে ফল কি দাঁড়ায়, তা বলবার দরকার করে না। এই সংসার নিত্য নূতন সমস্যা,

নিত্য নূতন সম্ভাবনা মানুষের সামনে খুলে ধরচে। প্রচলিত কথায় আছে বটে, History repeats itself; কিন্তু সে স্থূল কথা। বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাসের এক পর্য্যায়ের সঙ্গে অন্য পর্য্যায়ের কোনো দিনই হুবহু মিল হয় না। তাই মানুষ হিসাবে জীবন্ত তাকেই বলা যায় যে (ব্যক্তি বা জাতি) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সজাগ; অর্থাৎ এই চিরপরিবর্ত্তনশীল জগৎকে সে নিজের মন দিয়ে বুঝবার ক্ষমতা রাখে, আর বুঝে তার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে।

'জীবন্ত' কথার অর্থ পরিষ্কার হলে 'আধুনিক' কথার অর্থ আপনি পরিষ্কার হয়ে আসে, কেননা এদুটি একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ। যে জীবন্ত সে আধুনিক বা যুগধর্ম্মী হতে বাধ্য। তার প্রমাণ,—হজরত ওমর আর ইমাম গাজ্জালী। দুজনই সাচ্চা মুসলমান। কিন্তু হজরত ওমর ভুলেও দার্শনিকতার গহনে প্রবেশ করেন নাই, কেননা, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মতো ভাস্বর হজরত মোহম্মদের জীবন ছিল তাঁর সামনে; আর দার্শনিকতাকে পরিপাক করেই ইমাম গাজ্জালী প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন লাভ করতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি যে যুগের সন্তান সে যুগে মুসলমানের বিশাল জাগতিক জীবন জ্ঞানে কর্ম্মে বহুধা বিভক্ত হয়ে সত্য আর সার্থকতার সন্ধান করছিল। ঠিক এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য-চৈতন্যদেবের ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীতে দেখছি, মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির পুরোহিত; আর কালিদাস-বিদ্যাপতির মতো পরম সৌন্দর্য্যোপাসক রবীন্দ্রনাথকে

দেখছি, বারে বারে ঘুরে-ফিরে দেশের দুর্দ্দশার গান গাচ্ছেন।

আমাদের মানব-মুকুটের গ্রন্থকার একজন জীবন্ত ব্যক্তি বলেই যুগধর্ম্মের প্রভাব তাঁর ভিতরে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে। হজরত মোহম্মদের আদর্শের মাহাত্ম্য আর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু যে পদ্ধতিতে তিনি তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন সাধারণতঃ আমাদের আলেমদের পদ্ধতি তা নয়। খৃষ্টানের বা ইহুদীর ধর্ম্মগ্রন্থে হজরত মোহম্মদের আগমনের ইঙ্গিত আছে বলে' যে তিনি সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর একথা তিনি বলেন না; অথবা তাঁর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ড হয়েছিল, অথবা ইহুদীর বালতি তাঁর হাত থেকে কূঁয়োয় পড়ে গেলে হাত বাড়িয়েই তিনি তা তুলেছিলেন, হজরত মোহম্মদ সম্বন্ধে প্রচলিত এই সব অলৌকিক কাহিনীর প্রতি কি তাঁর মনোভাব ভুলেও তার কোনো ইঙ্গিত লেখক আমাদের জানতে দেন না। তাঁর পদ্ধতি ভিন্ন রকমের। "আনা বশারুম্ মেস্‌লোকুম্" আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, হজরত মোহম্মদের এই বাণীই তাঁর সমস্ত চিন্তা ভাবনার কেন্দ্র। সর্ব্ব প্রকারে এই আরবের মহাপুরুষ যে মানুষ,—সব অলৌকিকতা, সব অবতারত্ব, সব অমানুষিক কৃচ্ছ্র সাধনা, এ সমস্তের পরিবর্ত্তে তাঁর সমস্ত ব্যাপার যে সাধারণ মানুষের জীবনের মতনই স্বাভাবিক, কত যত্ন কত দক্ষতার সঙ্গে লেখক এই সমস্ত কথা বার বার তাঁর গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। আরবের এই মহাপুরুষ যে হাড়ে হাড়ে মানুষ,—দুঃখ কষ্ট সহন ব্যাপারে

তিনি মানুষ, উন্মাদিনী শক্তির আকস্মিক আবির্ভাবে নয় কিন্তু সাধনার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতিতে তিনি মানুষ, সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে মানবসুলভ ভয়বিহ্বলতার জন্য তিনি মানুষ, সিদ্ধ পয়গম্বর অবস্থায় পরম করুণ-প্রাণতার জন্য তিনি মানুষ, মানুষের নিকটতম আপনার জন, —এই সমস্ত কথা কত আনন্দে কত আবেগে লেখকের লেখনীমুখে উচ্ছলিত হয়ে উঠেচে !

"আনা বশারুম্ মেস্‌লোকুম্" প্রাচীন কথা। কিন্তু প্রাচীন বলেই কি সেটি আমাদের গ্রন্থকারের চিত্তের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে ? নিশ্চই নয়। আসল কথা, এ প্রাচীন সত্যের নব আবিষ্কার ; আর আধুনিক জীবনের প্রয়োজন রয়েছে এই আবিষ্কারের মূলে।—জীবন—উপবাস নয়, ত্যাগ নয়, মৃত্যু নয়—জীবন—অনন্ত সম্ভাবনা পূর্ণ, অনন্ত সুখ-স্বাদবিমণ্ডিত জাগতিক জীবন, অপরূপ হয়ে এ যুগের লোকের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে," "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়," এ সব কথা শুধু এ যুগের এক বড় কবিরই কথা নয়, কবির কণ্ঠে এই যুগেরই মর্ম্মোক্তি। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য, সমস্তই আজ নিযুক্ত এই জীবনের অপরূপতা, ব্যাপকতা, জটিলতা, ইত্যাদির পরিচিন্তনে ও ব্যাখ্যানে।

এরই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে মানব-মুকুটের লেখক বলছেন— "গৃহহীন খৃষ্ট ও বুদ্ধের প্রেম ও ত্যাগ আমাদিগের মনকে এতকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিবার

সময় আসিয়াছে যে, কে সেই মহাপুরুষ যিনি মানবের চির-কালের আবাসভূমি গৃহাঙ্গনকে তুচ্ছ না করিয়া পবিত্র ও মধুর করিয়াছেন; মানুষের বিচিত্র সুখ দুঃখ ও আশা আকাঙ্ক্ষাময় মরজীবনকে জীবনদ্বারা সার্থক ও সুন্দর করিয়া অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়াছেন ....।" হজরত মোহম্মদের জীবনের মাহাত্ম্য আলোচনা আমাদের লেখকের উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে আর একটি উদ্দেশ্য পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে;—আধুনিক জগতের যে জীবনসমস্যা, লেখক মানুষকে ডেকে বলতে চান, তার উপযুক্ত সমাধান মিলবে হজরত মোহম্মদের জীবনাদর্শে।

প্রশ্ন হতে পারে—যুগের যা চিন্তা-ভাবনার ধারা লেখক তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করছেন, তবে আর এতে এত তারীফের কি আছে?—তারীফের কথা এই, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মতো জীবনসমস্যার কথা মানব-মুকুটের গ্রন্থকার বলছেন না। এই জীবনসমস্যা বাস্তবিকই জেগে উঠেচে তাঁর ভিতরে। তাই তাঁর কথাগুলো ফাঁকা ফ্যাকাশে নয়—তাতে ফুটে উঠেছে অন্তরের অনুভূতির গাঢ় লাল রং। কেমন গলা ছেড়ে তিনি বলতে পারচেন—"তাঁহারা (সন্ন্যাসী মহা-পুরুষ) পথের ধারে গলিত কুষ্ঠ রোগী পড়িয়া থাকিলে কি করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু কি করিয়া সদুপায়ে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করা যায়,

পত্নীর প্রেমার্ত্তচিত্ত স্নিগ্ধ করিয়া পাতার প্রীতি লাভ করা যায় তৎসম্বন্ধে কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না।"—কিছু বাড়াবাড়ি এই সমস্ত কথার ভিতরে নিশ্চয়ই আছে; তবু আমাদের চোখে লাগে না কি, কি একটা বেদনাময় মানুষের মন রয়েছে এই সব কথার পিছনে?

এই যে নিজের অন্তরের অনুভূতি, সাহিত্যিকের, চিন্তাশীলের, এ প্রথম প্রয়োজন—প্রধান প্রয়োজনও বটে। পরে পরের যত অগ্রগতি, ভাবুকতার যত উর্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ, তার সমস্ত পাথেয়ের যোগাড় হতে পারে এই আত্ম-অনুভূতি থেকে। বাস্তবিক অন্তর্জীবনের পরিপোষণের জন্য সব চাইতে পুষ্টিকর উপাদান মিলতে পারে কেবল এই আত্ম-অনুভূতিরই ভিতরে।

কিন্তু শুধু এই জন্যই এয়াকুব আলী সাহেবের এই মানব-মুকুট বই খানিকে বাংলার মসলিম চিন্তা-জগতে এক অনুপম সূচনা বলা হয় নাই। এই আত্ম-অনুভূতির পাথেয়ের সাহায্যে তিনি উর্দ্ধতর গ্রামে আরোহণ করতে পেরেছেন। বিরাট পুরুষ মোহম্মদের মহাপ্রাণতা সামান্য কিছু উপলব্ধি করবার জন্য দ্রষ্টারও চাই যে সমুন্নত দৃষ্টিভূমি, বুঝতে পারা যাচ্ছে, সেই উচ্চতর গ্রামে লেখক নিজকে প্রতিষ্ঠিত করবার অধিকার লাভ করেছেন। তাই বলেছি, তিনি তাপস। জহুরী জওহর চিনে, এ চিরকালের সত্য। এই মানবমুকুট বই খানির জায়গায় জায়গায় হজরত মোহম্মদের যে আবেগময় তারীফ

অনর্গলভাবে বেরিয়ে এসেছে, সবারই কাছ থেকে কি ত আশা করা যেতে পারে?

তাঁর এই ক্ষমতা হীরকের মত ঝক্-ঝক্ করে' উঠেছে এর "মানুষের অধিকার" পরিচ্ছেদে,—যেখানে তিনি হজরত মোহম্মদের মনোরাজ্যে প্রথম সত্য প্রকাশের মহা মুহূর্ত্তের কথা লিখেছেন :—

"দৈবদ্যুতির প্রথম ছটায় তাঁহার চিত্ত চমকিত হইল; দৈববাণীর গম্ভীর নাদে তিনি সম্ভ্রম-শঙ্কায় কম্পিত হইলেন। তিনি কম্পিত কলেবরে গৃহে ফিরিয়া খোদেজা বিবিকে বলিলেন, 'ঢাক আমায় ঢাক—কাপড় দিয়া আমায় আবৃত কর।' ঐশী-শক্তির তাড়িত-তেজে রক্ত-মাংসের মানবদেহ সম্ভ্রম-সঙ্কোচে কম্পিত হইতেছে, সত্যজ্যোতির প্রথম ঝলক নরনয়ন সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না।"

অন্যত্র :—

"মহাপুরুষের সত্যপূত মহিমালোকে তাঁহার মানব-চিত্ত বারেকের নিমিত্ত কম্পিত হইয়াছিল, সেইক্ষণে রক্তমাংসের মানব-মন মহিমা লাভের আশার আবেগে মহানন্দে নৃত্য করিয়াছে।"............

বিরাট সত্যের সামনে সম্ভ্রম-সঙ্কোচে কম্পিত হওয়া, মহাজীবন লাভের আশার আবেগে মহানন্দে নৃত্য করা—এ সমস্ত কথা যে এমন অপূর্ব্ব আর অব্যর্থ হয়ে ফুটে উঠেচে, এ কি লেখকের অন্তঃকরণের জীবন্ত স্পর্শের জন্যই নয়?—মহাপ্রাণতার সামান্য

স্পন্দনও বাঙালী মুসলমানের বুকে জেগেছে, এর চাইতে সুখকর খবর আমাদের পক্ষে আর কি হতে পারে!

(৩)

এখানেই এ আলোচনার শেষ করতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু আর একটি কথা বলবার বাকি আছে; সেটি না বললে আমার এই তারীফের পূরো চেহারা বুঝ্‌তে পারা যাবে না। পূর্ব্বেই বলেচি, এই বইখানিতে লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় দুইটি—হজরত মোহম্মদের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, আর তাঁর আদর্শই যে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাই প্রমাণিত করা। আমরাই এই দুটিকে পৃথক করে দেখচি। কিন্তু লেখকের মনে এ দুটি অভিন্ন হয়ে ফুটে উঠেচে। হজরত মোহম্মদের আদর্শ—একাধারে সাংসারিক আর আধ্যাত্মিক জীবন—এর চমৎকারিত্ব তাঁর চোখে এতই বেশী যে, এ যে সুন্দর এ কথা বলে তাঁর তৃপ্তি হয় না, গলা ছেড়ে আপনা থেকে তাঁর বলা আসে—এই-ই সুন্দরতম, এই-ই মহত্তম।

একজন সাধারণ প্রচারকও নিজের ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের লেখকের যে পার্থক্য, সেটি লক্ষ্য না করলে তাঁর প্রতি খুব অন্যায় করা হবে। একজন সাধারণ প্রচারকের ভিতরেও প্রকৃত স্বধর্ম্ম-প্রেম বা স্বজাতি-প্রেম থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তার বহ্বাড়ম্বরের উদ্দেশ্য, মানুষ বাগানো, দল ভারী করা। কিন্তু 'মানবমুকুটের' গ্রন্থকার যখন জোশের

আতিশয্যে বলতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না—"মুহূর্তের মৃত্যু দ্বারা নহে, পরন্তু বহুবর্ষব্যাপী জীবন দ্বারা মানুষের জন্য আত্মত্যাগের যে আদর্শ তিনি (হজরত মোহম্মদ) দেখাইয়াছেন, তাহার নিকটে বুদ্ধের সুখত্যাগ ও খ্রীষ্টের প্রাণত্যাগ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে''—তখনো সমদর্শী মনীষী তাঁকে স্নেহের চক্ষে দেখতে পারেন এইজন্য যে, মহামানব বুদ্ধ আর খ্রীষ্টকে হীন সাব্যস্ত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়,—এমন এক বিরাট শক্তির ঔজ্জ্বল্যে তিনি মোহিত হয়েছেন যে সেদিক ভিন্ন আর কোনো দিকে চোখ ফেরাবার অবসর তাঁর নাই।

তাঁর এই পক্ষপাতিত্বকে আর এক ভাবেও দেখা যেতে পারে। বাংলা বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা হলেও এত কালের বাংলা সাহিত্যে তার বিশেষ কোনো দাবি-দাওয়া নাই, বরং তার যত প্রকৃত আর কল্পিত জঘন্যতা, মূঢ়তা, তারই ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে এই সাহিত্যে। তাই জাগরণের এই প্রথম মুহূর্তে বিরুদ্ধবাদীর অনেক কিছুই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, এ খুবই স্বাভাবিক।

তবু চৌধুরী সাহেবকে বলতে চাই, তাঁর স্বজন-প্রেম স্বধর্ম্ম-প্রেম যত সুন্দরই হোক না কেন, এ কথার স্থানও যেন তাঁর মনে থাকে যে, বিষয়টিকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখছেন ও দেখাতে চাচ্ছেন, তাঁরই মত বিদ্বান বুদ্ধিমান দৃষ্টিমান ব্যক্তি ঠিক তার উল্টোভাবেও দেখতে পারেন। যে সব কথা স্বীকার করে তিনি তর্কে নেমেছেন তার কেন্দ্রগত কথা

এই :—জগতে যত মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন যুগে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে পাপ তাপ থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁরাই মানুষের আদর্শ; তাঁদেরই ভিতরে যাঁর আদর্শ ব্যাপকতম গভীরতম তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—মহাপুরুষের গৌরব-মুকুট তাঁরই প্রাপ্য। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আমাদের লেখকের উপর খুবই কার্য্যকরী হয়েছে। যে সমস্ত যুক্তি-বলে 'বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন, তিনিও প্রায় সেই সমস্ত যুক্তির বলেই হজরত মোহম্মদকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে প্রতিপন্ন করতে যত্নবান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সমস্ত যুক্তি-তর্কও নির্ব্বিচারে গৃহীত হবার যোগ্য নয়। আদর্শবাদ জিনিসটিকেই অনেক মনীষী সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন ইমার্সন বলেছেন—"No facts are to me sacred ; none are profane ; I simply experiment, an endless seeker with no Past at my back." বাস্তবিক, গুরুবাদীর, আদর্শবাদীর, যেমন অভাব নাই, তেমনি এমন কথাও অনেক মনীষী বলেছেন,—অতি বড় যে ব্যক্তি তাঁর জীবন যেমন কালের শাসনের বাইরে নয়, তাঁর চিন্তা-ভাবনা মত-বিশ্বাসও তেমনি কালের শাসনের বাইরে নয়। অতি বড় যে কবি, তাঁর সৃষ্টির চমৎকারিত্ব কালে ম্লান হয়ে আসে; অতি বড় যে সত্যদ্রষ্টা, তাঁর দৃষ্টিও আংশিক দৃষ্টি বলে' কাল রায় দেয়।

তাই যে সব যুক্তি-বলে বঙ্কিমচন্দ্র বা আমাদের লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ বা হজরত মোহম্মদ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, একটুখানি ঘুরিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে, তা দুর্ব্বল যুক্তি-তর্ক। ভক্তের কাছে তাঁর প্রিয় আদর্শ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু এমন কোনো যুক্তি-তর্ক আছে কি না যার সাহায্যে কোনো মহাপুরুষকেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ-রূপে প্রতিপন্ন করা যায়, তা সন্দেহের বিষয়। অন্ততঃ আমাদের সামান্য জানা-শুনার ভিতরে এমন কোনো অকাট্য যুক্তি-তর্কের নাগাল আমরা আজো পাইনি।

এখন বোধ হয় বুঝতে পারা যাচ্ছে, মানবমুকুট গ্রন্থখানিকে আমি যে শ্রদ্ধার চোখে দেখি, তা কি ধরণের। যুক্তি-তর্কের দিক দিয়ে এর অসম্পূর্ণতা খুবই চোখে পড়ে; কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী করে' চোখে পড়ে এর লেখকের বলীয়ান হৃদয়—নব-সাধনায় যা তাজা আর রঙীন হয়ে উঠেছে! এই তাজা রঙীন হৃদয়েরই আমাদের প্রধান প্রয়োজন। তাই সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এক নব-জাগরণের পূর্ব্ব-লক্ষণ স্ফূরিত হচ্ছে এর পাতায় পাতায়। মহাপ্রাণতা যে কোনো বিশেষ যুগের সম্পদ নয়, প্রত্যেক যুগেরই পরম বিভব—তার অস্তিত্বের প্রমাণ, এই শুভতম সংবাদ এ বহন করে এনেছে বাঙালী মুসলমানের জীর্ণ দ্বারে।

চৈত্র, ১৩৩১

পণ্ডিত সাহেব

পণ্ডিত সাহেব

বন্ধুরা বল্‌লেন—"এত কাছে এবার সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে, চলো দেখে আসা যাক।" আমি বল্লাম—"কি সেখানে হবে তার কল্পনা করা তোমাদের পক্ষে এতই কি শক্ত?" তাঁরা বল্লেন—"রাখো তোমার কুড়েমি, এবার যেতেই হবে; তৈরী হও।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে মুন্সীগঞ্জ অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। যাচ্ছিলাম আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বটে, কিন্তু সেদিন আমাদের সত্যকার ব্যাপার ছিল নিরুদ্দেশ ভ্রমণ; তাই পথে মহাজন-সন্দর্শন, পুরাতন আলাপীর সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাৎকার, এসমস্তের ছটা সেদিন আমাদের অবসরের লালিমাসমুদ্রে তেমন বিশেষ কোনো বর্ণসমৃদ্ধ তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করে নাই।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছা গেল। আমাদের বাস নির্দ্দিষ্ট হলো শহরের কিছু বাইরে মাঠের মাঝখানে এক দালানে। চার-দিকেই খোলামাঠ; পূবদিকে কিছুদূরে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মা-অভিসারী এক খাল; দূরে কৃষক পল্লী,—শুধু সবুজ গাছের ভিড়; চষা-পরিপাটি মাঠে শোভা পাচ্ছে চারা ধান গাছ। মনে মনে খুশী হয়ে ভাবলাম, আমাদের এবারকার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের উপর বিধাতার সুন্দর হস্তের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

যথা সময়ে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া গেল। যথাবিহিত অভিনন্দন-অপ্যায়ন সুনিষ্পন্ন হলো। সাহিত্যমহারথিবৃন্দ

একে একে তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করে চল্লেন। যথন যেখানে করতালির প্রয়োজন গল্প আর ধূমপান ক্ষণকালের জন্য বন্ধ করে' তা সমাধা করে' শ্রোতৃমণ্ডলী নিজেদের সমঝদারির পরিচয় দিলেন। বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি, তার বর্ত্তমান অবস্থা, তার ভবিষ্যৎ, তার চমৎকারিত্ব, তার ত্রুটী, বাঙালীর জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতা, তার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিষয়ে বহু মন্তব্য শ্রবণ করবার সৌভাগ্য আমাদের হ'লো। তা রাত্রে ফিরে এসে গ্রাম্য বাবুর্চ্চির বিশুদ্ধ ঘৃতের পোলাও, টাটকা মুরগীর কোরমা, আর রামপালী কলা উদরস্থ করে ভলান্টিয়ারদের ভূয়সী প্রশংসা করলাম, আর মনে মনে ভাবলাম—যাক্, আমাদের এবারকার নিরুদ্দেশ ভ্রমণের রস কিছুতেই গেঁজে যাবেনা এমন আশা করতে পারি।

জ্যোৎস্না-আলোকিত মাঠের মাঝখানে এই ঘরটিতে বহু রাত পর্য্যন্ত দরজা জানালা খুলে রেখে শেষে ঘুমিয়ে পড়া গেল। গানের শব্দে সকালে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, পাশের বিছানায় বসে' এক বন্ধু ভৈরবী-ললিত-মিশানো একটি গান গাচ্ছেন। আমার পানে চেয়ে তিনি হাসলেন, আমিও হাসলাম। পাশে চাইতেই দেখলাম—একজন গ্রাম্য মুসলিম গোছের লোক ওধারের চেয়ারে বসে' আমারই দিকে চেয়ে আছেন। তিনি আদাব করলেন; আমিও আদাব করলাম। কালো স্বাস্থ্য-সমন্বিত জওয়ান চেহারা তাঁর, মুখে অনম্য ঝাঁকড়া দাড়ি, কালো পুরু ওষ্ঠের উপর শক্ত গোঁফ খাটো করে' ছাঁটা; চোখ দুটি

ছোট, তাতে যে দৃষ্টি তাতে যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য।

তহ্‌বন-পরা লম্বা নীল কোর্ত্তা গায়ে এই বলিষ্ঠ ব্যক্তি বিনীতভাবে আমার বিছানার এক পাশে এসে বসলেন। তাঁর বাঁহাতে কয়েকখানি খাতা। একখানি খুলে আমার সামনে রেখে বল্লেন, "এক নূতন পদ্ধতিতে আমি এই বইখানি লিখেছি, মেহেরবানী করে একটু পড়ে দেখুন।" কিছু সন্দিগ্ধ চিত্তে খাতাখানি হাতে তুলে পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে এখানে ওখানে দেখতে লাগলাম। দুই এক জায়গায় লেখার যে বাঁধুনি চোখে পড়লো তাতে কিছু বিস্ময় বোধ হলো। তাঁকে বল্লাম, "আপনি পড়ুন আমি শুনি।" তিনি পড়তে লাগলেন। প্রথম শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের কি করে' মুখো-মুখি বানান শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এর যে ভূমিকা তিনি পড়লেন তার কয়েকটা কথা এই,—"যে পথ দুর্গম চেষ্টা করে সে পথকে সুগম করা যায়। যা জটিল তাও চেষ্টা করে আয়ত্ত করা যায়, আর তা আয়ত্ত করবার সহজ পথ নির্দ্দেশ করা যায়। তবে কেন সরলমতি শিশুদের মনে ভীতি অথবা অরুচি উৎপাদন না করে' তাদের মাতৃভাষার বর্ণবিন্যাস স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যাবেনা?"—আমার আন্তরিক প্রশংসার অবধি ছিলনা। মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করছিলাম—সত্যান্বেষীর পক্ষে অবশ্যলভ্য যে বিজ্ঞানদৃষ্টি এই অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য লোকটির পক্ষেও তা কি অদ্ভুতভাবে সম্ভবপর হয়েছে।

পড়া শেষ হলে তাঁকে সাধুবাদ প্রদানে কার্পণ্য করতে পারলাম না। তিনি বল্লেন এটি প্রকাশ করতে তিনি ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁর মতো নগণ্য ব্যক্তির বইয়ের আদর কি স্কুলকর্ত্তৃপক্ষেরা করবেন। আমি বল্লাম, এ ব্যপারে আমারো ক্ষমতা তাঁরই মতো, তবে অন্য কোনো উপায়ে যদি আমার দ্বারা কোনো কাজ হয় তা তো নিশ্চয়ই করবো।

লোকটির সঙ্গে আলাপের গাঢ়ত্ব সহজেই সম্ভবপর হলো। অতি অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরই তাঁর দৈনন্দিন জীবনের নানা ছোট খাটো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম। সহজভাবে তিনিও সে সমস্তের উত্তর দিলেন। তিনি গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক; বহুকাল পর্য্যন্ত গ্রামের খতিবও ছিলেন; কোনো রকমে দিন-গুজরান হয়—অর্থাৎ বাংলার মুসলমানদের হাজারকরা নয়শত নিরানব্বই জনের যে রকমে হয়। আমাদের আলাপ এগিয়ে চল্লো। শেষে এমন একটা জীবনের ছাপ আমার চিত্তপটে মুদ্রিত হলো যা গ্রাম্য পণ্ডিতের নয়, কবিযশঃপ্রার্থীরও নয়,—যার প্রত্যাশা এবারকার নিরুদ্দেশযাত্রার প্রারম্ভে স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারিনি।

পণ্ডিত সাহেব একে একে তাঁর পনেরো বৎসরের শিক্ষকতার কথা আমাকে বল্লেন। গ্রামের লোকেরা তাঁর প্রতি সদয় নয়। তাঁর স্কুলের ছাত্রেরা প্রায়ই বৃত্তি পায়; স্কুল পরিদর্শকরা তাঁর খুবই প্রশংসা করেন; এ সমস্ত আর গ্রামের লোকদের চোখে সহ্য হয় না। আমি বল্লাম—"তা শিক্ষকতা তো আর সকলে

করে না যে প্রশংসা পাবে।" তিনি বল্লেন—"সে চেষ্টা কি আর তারা করে নাই। কিন্তু স্কুল খুলে কদিন চালাবার ক্ষমতা তাদের আছে। দুইবার খুব তোড়ে জোরে দুই স্কুল খুলেছিল। তাদের স্কুল আর কদিন চলতে পারে। ছাত্রদের পড়ানো হয় না, তারা পাশ করতে পারে না, তারা পালিয়ে শেষে আবার আমার স্কুলে এসে ভর্ত্তি হলো।" হেসে বল্লেন, "পেটে বিদ্যে বুদ্ধি কিছু থাকলে তো স্কুল চালাতে পারবে।"

—দিল্‌খোলা এ হাসি, তবে এর পর্দ্দায় পর্দ্দায় বিদ্রূপের বিষ আর ব্যর্থতারও প্রতিঘাত।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের প্রকৃত কারণ কিছু অনুমান করতে পারলাম। তবু বল্লাম, "এ তো আড়াআড়ির কথা। কি নিয়ে এঁদের সঙ্গে আপনার মনোমালিন্যের সূত্রপাত যাতে তাঁরা ভিন্ন স্কুল খুলেছিলেন ?" তিনি বল্লেন, "তারা গ্রামের মাতব্বর। তাদের দলাদলিতে আমি সায় দিইনে। আমাকে প্রকারান্তরে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলে; তা আমি দেব কেন। এই সব নিয়েই আমার সঙ্গে বিরোধ। সে বহু কথা। একবার এক মাতব্বরের ছেলে "ইদ্দত" পার না হতেই এক বিধবাকে নিকে করতে পাগল হয়ে উঠলো। মোড়ল আমাকে নিকে পড়িয়ে দিতে বল্লে। আমি বল্লাম—'শরা'র বিরুদ্ধ কাজ আমি পারবোনা। এই নিয়ে মোড়ল আমার উপর মহা খাপ্পা। অন্য এক মুন্সীকে দিয়ে নিকে পড়িয়ে নিলে—হয়ত কিছু ঘুষের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার উপর খুব গালাগালি

করলে, বল্লে, "জানেন না এক হরফ ঝাঁক মারেন বড় মৌলবির মতো।" আমি বল্লাম, "বড় হই আর ছোট হই তোমরা তো এসবের কিছু জাননা যে তোমাদের সঙ্গে তর্ক বিচার হবে। কোনো নাম-করা আলেমকে মধ্যস্থ মানো, তখন যদি আমার কথা ভুল সাব্যস্ত হয়, আমি খাট মানব।"

মনে মনে বলছিলাম "তোমার সঙ্গে যদি এদের বনিবনাও হয় তবে আর অ-বনিবনা হবে কার সঙ্গে।" এই সবলমেরুদণ্ড-সম্পন্ন আত্মাভিমানী গ্রাম্য পণ্ডিতের প্রতি এক আন্তরিক স্নেহ আর সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরে উঠ্‌ছিল। একধার থেকে তিনি গ্রামবাসীদের শ্রাদ্ধ করে চলেছিলেন; "এরা লোক দেখিয়ে নামাজ পড়ে; পরের অনিষ্ট আর নিজের স্বার্থ সিদ্ধির দিকেই এদের মন; এরা নামে মাত্র মুসলমান, কাজে একদম পশু; ইত্যাকার বচনে তাদের সবিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছিলেন। হাসিমুখে তাঁর সমস্ত কথাই শুনছিলাম, আর ভাবছিলাম—"মুকুলিত আমগাছ তার উগ্রগন্ধে কেন দশদিক আন্দোলিত করে' তোলে, আর তার পাশে শাওড়া গাছ কেন শ্রীহীন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ তত্ত্বের তাৎপর্য্য গ্রহণ তোমার জন্য নয়।"
—শেষে পণ্ডিত বল্লেন, "এরা যে কি শক্ত 'জাহেল' তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। কতকগুলো মেয়েও আমার কাছে কোরাণশরীফ পড়ে। তারই ভিতরে একটি মেয়ে কি 'নেক-খাসলত' আর পড়াশুনায় দক্ষ হয়েছিল।। কোরাণশরীফ খতম করেছিল। উর্দ্দু মেফ্‌তাহুলজান্নাত শেষ করেছিল।

বাংলা নিম্নপ্রাইমারি পর্য্যন্ত পড়েছিল; কিন্তু সাহিত্যে উচ্চ-প্রাইমারি ক্লাসের ছাত্রেরাও তার কাছে কিছু নয়। আর কি তার হাতের লেখা! স্কুল সব্-ইনসপেক্টর বলেছিলেন—এ পর্য্যন্ত নিম্নপ্রাইমারির কোনো ছাত্র ছাত্রীর লেখাই তিনি অত সুন্দর দেখেন নাই। এই জাহেলরা আমাকে জব্দ করবার জন্য তাকেই বিয়ে দিলে এক আকাট মূর্খের সঙ্গে।”—তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে এল, মুখ ফিরিয়ে জামার আস্তিনে তিনি চোখ মুছলেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম। শেষে ধীরে বললাম, “তা মেয়েটার বাপ মা.. ...” তিনি বল্লেন, “বেশী টাকা তারা পেলে—আর তাঁরা কি দেখ্‌বে।”

অদূরে-বসা আমার এক ইতিহাসজ্ঞ বন্ধু আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। তিনি বল্লেন, “যাঁরা অগ্রবর্ত্তী চিরকালই তাঁদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। পেট্‌সালোট্‌সি যখন তাঁর নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে শিশুর শিক্ষা বিধানে অগ্রসর হলেন, অভি-ভাবকরা তাঁর কাছে সন্তান পাঠাতে পর্য্যন্ত রাজি হলেন না। রাস্তার বেওয়ারিশ ছেলেদের নিয়ে প্রথম তাঁর নূতন ধরণের শিক্ষা চল্লো।”

কিন্তু হায়, এর কি কোনো সান্ত্বনা আছে! নীরবে বসে তাঁর বলিষ্ঠ বেদনামাখা চিত্তের উত্তাপ আর জ্বালা অনুভব করতে চেষ্টা করছিলাম। ইচ্ছা হচ্ছিল বলি, “আপনার যে দুঃখ, তা বহুনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত বলেই তো বাংলার মুসলমান আজ হতভাগ্য।” তা আর সাহস হলো না। কথাটা তাঁর কাছে

হেঁয়ালীর মতো শোনাবার সম্ভাবনাই বেশী।

সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে' তাঁকে জয়ী হতে হবে, শেষে এই সব বলে তাঁকে বিদায় দিলাম। সম্মেলনের বৈঠক দুই দিনের জায়গায় তিন দিন হলো। সুখাদ্য, সু-আলাপ, গান, জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত মাঠে বাসের রোমাঞ্চ, তেমনই চল্লো। কিন্তু সেদিনের সমস্ত সুখস্মৃতির পুষ্পদলের মাঝখানে কাঁচা নবীন ফলের মতো জেগে রয়েছে এই গ্রাম্য শিক্ষকের স্মৃতি। সেখানে আলাপের দিনের অবসানে রাত্রে সেই মাঠের ভিতরকার দালানে পায়চারি করতে করতে দূরে গ্রামের পানে চেয়ে ভাবছিলাম তাঁর কথা। মূঢ়, গতানুগতিক, সর্ব্বপ্রকারে দরিদ্র, গ্রামবাসীদের মাঝখানে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছে, কিছু উগ্র, আত্মাভিমানী, ন্যায়নিষ্ঠ, উন্নত জীবনের আগ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট, এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত পুরুষ। সেবারকার সাহিত্য সম্মেলনে এই ছিল আমার সব চাইতে বড় তথ্যের আবিষ্কার।

আজ পুনরায় যখন সেই স্মৃতি মনে ভেসে উঠ্ছে তখন দেখ্‌চি, সত্যই এ এক আবিষ্কার। সর্ব্বপ্রকারে অধঃপতিত বাংলার বিশাল মুসলমান সমাজের পুঞ্জীভূত প্রাণহীনতার মাঝে হেথায় হোথায় ক্বচিৎ কখনো সত্যকার প্রাণস্পন্দনও যে অনুভব করা যায়, এ তারই আবিষ্কার। কিন্তু সেদিন ভেবে কিছু দুঃখিতই হয়েছিলাম,—এই সামান্য প্রাণ-শক্তির চারপাশ ঘিরে কি বিকট মৃত্যু! তার গ্রাস এ কতক্ষণ এড়িয়ে থাকতে পারবে!

আজ যখন ভাবচি, দূরে গণ্ডগ্রামে সেই পণ্ডিত নিত্য তার

পারিপার্শ্বিক হীনতার সঙ্গে যুঝছে, হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,—তার জন্য সহানুভূতি হলেও দুঃখবোধ নাই। এ সত্যকার প্রাণবহ্নি—নির্ব্বাপিত হওয়ার আগ পর্য্যন্ত তার পরিবেষ্টকে দহন করে চল্‌বে। —এ দহনের বড় প্রয়োজন।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

কাজি ইমদাদ-উল্‌-হক্‌ স্মরণে

কাজি ইমদাদ-উল্-হক্ স্মরণে

ছেলেবেলা থেকে কাজি ইমদাদ-উল্-হক্ সাহেবের কথা শুনে আসছি ;—শিক্ষিত মুসলমান সমাজে তিনি নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন, তা ছাড়া আমার মুরুব্বিগণের তিনি সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে বহু দেরীতে, —১৯২০ সালে। ১৯১৮ সালে তাঁর প্রথম অস্ত্রোপচার হয় ; তার পর থেকে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যে রোগভোগই করেছেন বেশী। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই দুর্লভ মানুষদের একজন, 'নিজের মন' বলে' একটি অনুপম বস্তুর যাঁরা অধিকারী। আর তাঁর সেই মনটি ছিল আনন্দোজ্জ্বল, আর, মোটের উপর, অজটিল। তাই এই ক্রমাগত ক্ষয়কর অসুস্থতার ফাঁকে ফাঁকেও দেখেছি—তাঁর প্রাণ পুরুষের এক সুন্দর পরিচয় অনেক সময় আপনা থেকে উৎসারিত হয়েছে। এক অক্ষয় আনন্দকণা রূপে তাঁর সেই পরিচয় আমার চিত্তভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে—তাঁর সকল বন্ধুর অন্তরেই হয়ত তা সঞ্চিত থাকবে।

তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পর তাঁর এক পুরাতন বন্ধু কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন—"জীবনে কতজনের সঙ্গেই তো আলাপ পরিচয় হয় ; কিন্তু তাঁদের ক'জনার কথা মনে থাকে। কাজি ইমদাদ-উল্-হক্ সাহেবকে কিন্তু ভুলতে পারব না।"— বাস্তবিক তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরা তাঁকে ভুলতে পারবেন না ; কেননা দুর্লভ

আনন্দধন তাঁর কাছে তাঁরা পেতেন। লোকের প্রয়োজনের চরিতার্থতা তাঁর হাতে কম হয়নি। কিন্তু সেই প্রয়োজনের দাবি এক স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে চুকিয়ে দিয়ে কত সহজ ভাবে আনন্দ আর ভব্যতার প্রাচুর্য্য নিয়ে তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন! কত দুর্লভ এই স্বভাবসিদ্ধ ভব্যতা আর আনন্দ আমাদের এই তাত্ত্বিক আর বক্তৃতাকারের দেশে! আরো কত দুর্লভ আমাদের এই নিরানন্দ মুসলমান সমাজে! বাঙালী মুসলমানের চিত্তবিকাশের ধারায় আবদুল্লাহ্, প্রবন্ধমালা, নবিকাহিনী, বোগ্‌দাদি গল্প প্রভৃতির লেখকের কি স্থান, তার নির্দ্দেশ পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিক করবেন; কিন্তু যে সহজ আনন্দের উৎস-রূপে তিনি তাঁর বন্ধুবর্গের সামনে প্রতিভাত হয়েছিলেন তা তাঁদের মনোজগতে চিরন্তন হ'য়ে থাক্‌বার দাবিই বেশী করে' করে।

১৯২০ সালের এপ্রেল কি মে মাসে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তখন তাঁর কলকাতা থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে' আস্‌বার প্রাক্কাল। সন্ধ্যার পর আমরা ক'বন্ধু এক-দিন তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর বইয়ের-আলমারি-দিয়ে-সাজানো বসবার ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। উজ্জ্বল-চম্পক-বর্ণ, উজ্জ্বল-চক্ষু, বেশে আস্‌বাব পত্রে মার্জ্জিত-রুচি,—একটি সহজ আনন্দচ্ছটা যেন তাঁর চোখে মুখে সদাই খেল্‌ছে! অল্প কিছুদিন আগে কঠিন অস্ত্রোপচার ভোগ করে' তিনি যে উঠেচেন সে কথা তাঁকে দেখে বিশ্বাস করা শক্ত।

আর একদিনের কথা মনে আছে। বোধ হয় গত বৎসরের আগের বৎসর, পদ্মায় কিছুদিন ঘুরে বায়ু পরিবর্ত্তন করে' এলে ঠাৎ তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা। তাঁর পরিধানে ছিল য়না সিল্কের ইয়োরোপীয় পোষাক,—সেই পোষাকের রঙের সঙ্গে তাঁর মুখের রঙের ও চোখের স্ফূর্ত্তির চমৎকার সঙ্গত চ্ছিল।. দেখেই খুশী হয়ে' বল্লাম—"বাঃ! আপনি যে এক-ম সেরে উঠেছেন!" তিনি হেসে বল্লেন—"আমাকে দেখলে াই মনে হয়; এমনকি, লোককে অনেক সময় বিশ্বাস করানো শক্ত হয় যে আমার শরীর অসুস্থ। —কিন্তু বাস্ত-বিকই শরীরে আর কিছু নেই।"—জীবনানন্দ তাঁর ভিতরে এমন সহজ ভঙ্গিতে সর্ব্বদা উৎসারিত হতো যে তার পরিমাণ য কত বেশী ছিল সে কথা সাধারণতঃ কারো মনেই াড়্ত না।

এই ভগ্ন স্বাস্থ্যেও তাঁর সঙ্গে দেখা হলে নানা কথার অবতারণা তিনি করতেন। তার অধিকাংশই বাঙালী মুসলমান সমাজের অদ্ভুত রীতি-নীতি বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পর্কে। কন্তু ঠিক সংস্কারকের মনোভাব তাঁর ছিল না। ছেলে-পিলের লালন পালনে আদবের অর্থশূন্য কড়াকড়ি, অবরোধের বিড়ম্বনা, মুসলমান সমাজপতিদের বুদ্ধির স্থূলতা—এই সমস্ত নিয়েই তিনি মৃদু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। মুসলমান সমাজের বজ্রকঠোর গোঁড়ামিকে তিনি সামনা-সামনি আঘাত করতে যাননি, অথবা চাননি; তার পাশ কাটিয়ে নিজের পরিজন ও

বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটা সুন্দর অথচ ঘাতসহ জীবনের আয়োজন করে যেন সমাজকে বলতে চেয়েছেন—আমি জীবন উপভোগ করছি, তোমরা যদি না পার সে তোমাদের দুর্ভাগ্য।

তাঁর জীবনের একটি বিশেষ ব্যাপার ছিল তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা। তাঁর লিখিত শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলিতে, তাঁর নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রে, এর প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও তাঁর বিশিষ্টতা ছিল এই যে তাঁর উদ্ভাবিত কোনো বস্তু বা কোনো শিক্ষা প্রদানের নিয়ম খুব সুন্দর হলেও তা নিয়ে বিশেষ হৈচৈ তিনি কখনো করেন নি। তাঁর নানা শ্রেণীর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাঁরা এই সমস্ত বিষয়ে কৌতূহল অনুভব করতেন তাঁদের নিয়ে এ সমস্তের আলোচনা কিছু করতেন; তাঁরা দেখে সন্তুষ্ট হতেন, বিস্মিত হতেন, তিনিও খুশী হতেন, আর সময় সময় তাঁর ছেলেপিলের শিক্ষাদীক্ষায় সে সব ব্যবহার করতেন,—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত! এই আনন্দময় উদ্‌ভাবনা তাঁর নিত্যসহচর ছিল।

এম্‌নি এক সরল, চটুল, অথচ অনাড়ম্বর, ভঙ্গিতে দীর্ঘতর জীবন তিনি অতিবাহিত করতে পারতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তা ছিল না। এই সুকুমার জীবনে তিনি সন্ধান করেছিলেন কঠিন ব্যাধিশর। তবে, এই কঠিন আঘাত সহ্য করেও, তাঁর দত্ত আনন্দকে বহুল পরিমাণে অম্লান রাখবার ক্ষমতা তিনি তাঁর এই বান্দাকে দিয়েছিলেন।

সেদিন কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মৌলবী আনোয়ার-উল-

কাজি ইমদাদ-উল্-হক্ স্মরণে

কাদির বল্‌ছিলেন,— কাজি ইমদাদ-উল্-হক্ সাহেবের মৃত্যুর পর থেকে বাংলার মুসলমান সমাজে হয়ত একটা নূতন যুগের সূত্রপাত হবে। জীবনকে তিনি কিছু স্বাধীনতায় ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে' উপভোগ করেছিলেন; অনেক বিষয়েই কিছু কিছু নূতনত্ব তাঁর ভিতরে ছিল, সেই সমস্তের খবর মুসলমান সমাজ যদি নেয়, আর সে-সব আত্মস্থ করে' তারা যদি দাঁড়াতে পারে, তা হলে' উন্নতির পথে কয়েক পা তারা এগোবে।—তাঁর একথা মিথ্যা নয়। সুন্দর অথচ স্বল্পজীবী কাজি ইমদাদ-উল্-হক্ নানা দিক দিয়েই বাঙালী মুসলমানের চিত্তোৎকর্ষের সৌধের জন্য মূল্যবান উপকরণরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। জড়তায় ক্লিষ্ট, তামসিকতায় সমাচ্ছন্ন, বাঙালী মুসলমান সমাজের কোলে প্রথম যৌবন থেকে এই তেতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সুন্দর অথচ ক্ষীণ দীপশিখার মতো তিনি স্বাধীন-চিত্ততা নিয়ে জ্বলেছেন; নিজের পারিবারিক জীবন ঘিরে সরসতার ব্রততী লতিয়ে তুলে মুসলমানের ঊষর চিত্তক্ষেত্র পল্লবিত করার অব্যর্থ ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। . .

কিন্তু আজ সে-সব বিচার বিতর্ক নয়। আজ আমরা, তাঁর অনুরক্ত বন্ধুবর্গ, শুধু এই কথাটাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর জান্নাতবাসী আত্মার উদ্দেশ্যে বার বার নিবেদন করি যে তাঁর সাহচর্য্যে একদিন আমরা আনন্দলাভ করেছি;— তাঁর স্মৃতি আমাদের চিরপ্রিয়। এক অল্প পরিসরে নিরলসতা, ভব্যতা, উদ্‌ভাবনা, আর আনন্দ নিয়ে তাঁর সমগ্র জীবন এক

সুন্দর সৃষ্টির ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল; তাই বিদেহী হলেও বিস্মৃত তিনি হতে পারেন না;—No perfect thing is too small for eternal recollection—পূর্ণাঙ্গ যা, তা যত ছোটই হোক, চিরস্মরণের অযোগ্য তা নয়।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের শোক-অধিবেশনে
পঠিত। ১০ই এপ্রেল, ১৯২৬।

সৃষ্টির কথা

সৃষ্টির কথা

কলকাতার জনসমুদ্র আর কর্ম্মসমুদ্রের এককোণে কবি আর তাঁর বন্ধু আরামে দিন গুজরান করছিলেন। কবি কবিই, অর্থাৎ, জীবিকার্জ্জনের জন্য চেষ্টা তাঁর অবসরের সুরসঙ্গতিতে কোনো বেসুর-সংযোগ ঘটায়নি। কলেজ থেকে বের হয়ে' ওয়ালেদ সাহেবের তাড়াহুড়ায় মাত্র কয়েক দিনের জন্য তাঁর শান্তিতে কিছু ব্যাঘাত ঘটেছিল, তিনি বলেছিলেন, "ভাল চাকরির চেষ্টা যখন করলে না তখন তোমাকে উকিল হতে হবে;" তা কবি আপন মনে হেসে ভেবেছিলেন—ওঃ বাপগুলো কি নিদারুণ বুড়ো!

ছোট একখানি বাড়ী আর সামান্য কিছু আয়ের সংস্থান রেখে বৃদ্ধ পরলোক গমন করলেন। কবি এতটাও আশা করেননি। "A loaf of bread and cup in hand"—এর ভবিষ্যৎ "loaf" তাঁর বিবেচনায় ছিল সহজলভ্য মাষ্টারি। এইবার তাঁর বন্ধু এসে যখন বল্লেন, "একটা দরখাস্ত-টরখাস্ত কোথাও পাঠাও;" কবি বললেন, "ক্ষেপেছ নাকি?",

কবির সহযোগী বন্ধুটি কিন্তু 'লজ্জতে গুর্‌ব্‌' সমন্ধে কিছু ওয়াকিফ-হাল থাকলেও কলেজ থেকে বেরুবার পরই সওদাগরি হৌসে যে একটি কাজ নিয়েছিলেন সেখানে দৈনন্দিন উপস্থিতিতে কোনো দিনই তাঁর ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। কবি

প্রথম প্রথম এতে অবজ্ঞা তো প্রকাশ করতেনই (তাঁর বন্ধু অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন লোক), কিছু অসন্তুষ্টও তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু শেষে বল্‌লেন—"নাহে তুমি খাসা রসিক আর বুদ্ধিমান। ফুল ফুটে থাকে, মলয়ের ঝলক দীর্ঘ অবসরের ফাঁকে ফাঁকে এসে তার সঙ্গে মোলাকাত করে' যায়।"—সকালে সন্ধ্যায় তাঁদের মিলন সূর্য্যোদয়ের মতো অবশ্যম্ভাবী। কি আলাপ তাঁদের হয়, কি তার উদ্দেশ্য অর্থ, তার সন্ধান দেবে কার সাধ্য।

কবিকে তাঁর বন্ধু ঠাট্টা আর আদর করে বল্‌লেন ever-green. Evergreen-এর মতনই তিনি চিরশ্যাম আর কলহীন,—অর্থাৎ, মসী আর মেসিনের কলঙ্কছাপ-বিবর্জ্জিত কবি। কবি উত্তর দেন, "সেকি অগৌরবের হে বন্ধু! কাব্য সংসারে ক'জন বোঝে। তুমি বোঝো, তোমার কাছে তো আমি কবিই।"

কবির কথা শুনে তাঁর অন্তর্য্যামী সেদিন হেসেছিলেন।

(২)

কালধর্ম্মেই বল, আর লীলামাহাত্ম্যেই বল, মহাত্মার অসহযোগের মতো শক্তিপ্লাবন ভারতের শত শত বৎসরের ঊষর স্থবির চিত্তে সম্ভবপর হলো। সকলেরই মতো কবিও সেদিন এর সূচনাকে অসাধারণ কিছু ভাবেন নাই; তাঁর বন্ধুকে তিনি বলছিলেন—"পাগড়ি-মাথায় এই মেড়ো-চেহারা গান্ধী

লোকটি কি যে বল্ছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা হে, তবে আওয়াজটা কেমন মোটা আর জোরালো।"

তার পর অঘটন ঘটলো। কাগজে কাগজে উচ্চ প্রশংসা আর তীব্র নিন্দা, সভাসমিতিতে ধুম বক্তৃতার নির্ভীকতা, আর এই সমস্তের ভিতরে চরকা আর খদ্দরের অমার্জ্জিত শ্রী, নীরব কর্ম্মশক্তি,—কবি আর তাঁর বন্ধুর সকালে সন্ধ্যায় বিশ্রম্ভ-আলাপ কোন্ অতলে তলিয়ে গেল। "এ এক নূতন ব্যাপার! নূতন কর্ম্মশক্তি! বাংলার মেরুদণ্ডহীন ভাবুকতা কি হতশ্রী এর সামনে!" এই কবির মুখের সব সময়কার বাণী হয়ে' দাঁড়াল। তাঁর সমঝদার বন্ধুর চিত্তও মহা-আন্দোলিত। তবু মাঝে মাঝে তাঁর কবিকে বলতে খুবই লোভ হচ্ছিল— "কিন্তু অবসর যে অবসর গ্রহণ করলে কবি।" তা কবির বিষম আস্ফালনের সামনে সে কথা বলতে তাঁর সাহস হয় নাই।

সেদিন বাতি জ্বালিয়ে কামরায় বসে' কবি কিছু লিখছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে খবরের কাগজ হাতে তাঁর বন্ধু নীরবে হাসিমুখে তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। কবি আরো খানিকক্ষণ লিখে বন্ধুর মুখ পানে চেয়ে হাসতে হাসতে সে লেখাটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্লেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বললেন, "আজকার খবর কি পড়ো।" বন্ধু বললেন, "আজকার খবর খবরেরই মতো, শোনো।"

মহাত্মার কৌপীন ধারণের খবর। ......খদ্দর এখনো দেশে প্রচুর নয়; কিন্তু আমাদের জাতীয় অপমানের প্রতিমূর্ত্তি বিদেশী বস্ত্রের পরিবর্ত্তে নিজেদের হাতের তৈরি খদ্দরই চাই ....তার উপর ভারতের কোটি কোটি নরনারী লজ্জা আর শীতাতপ নিবারণের জন্য অতি সামান্য বস্ত্রের সংস্থানই করতে পারে......।

বন্ধু শান্ত কণ্ঠে সেই সভার বিবরণ আর মহাত্মার বক্তৃতা পড়লেন। উত্তাপবিবর্জ্জিত চির-উজ্জ্বল কথা, প্রেম আর কর্ম্মশক্তি যার ভিতরে অমর রসবিগ্রহ লাভ করেছে!

সেদিন তাঁদের আর কোনো কথাবার্ত্তাই হলো না। একটু মুখ ফিরিয়ে কবি বসেছিলেন, বন্ধু তাঁর মুখের অর্দ্ধেক মাত্র দেখতে পাচ্ছিলেন। শেষে আস্তে আস্তে উঠে দরজা ভিড়িয়ে তিনি আজকার মতো কবিকে নীরব বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন।

(৩)

পশ্চিমে এলাহাবাদের এক ছোট নির্জ্জন বাড়ীতে কবির বর্ত্তমান বাস। খেয়াল আর চিন্তা তাঁকে পাগল করে' তুলেছে বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। কোনোদিন সমস্তদিন চরকা কাটেন, কোনোদিন রোজা রাখেন। কোনোদিন ওক্তের পর ওক্তো নামাজ পড়ে' চলেন; সেজদায় যেভাবে পড়ে থাকেন মনে হয় যেন আর উঠ্‌বেন না। কোনোদিন অটলভাবে উপবিষ্ট হয়ে বার বার মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকেন তাঁর প্রিয় "সুরা ফাতেহা"। তাঁর আদরের সমস্ত কবি ও কাব্য

আজ তাঁর কাছে স্বাদহীন—পান্‌সে। কচিৎ কখনো টেনে নেন ইমার্সন, কোরআন, কিংবা গীতা; সামান্য কিছু পড়েন; সহসা দুই একটা কথা তাঁর মনের তারে এমন কঠিন ঝঙ্কার দেয় যে বই ফেলে উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি ইতস্ততঃ পদ-চারণা করতে থাকেন।

কয়েকমাস অতীত হলো। শেষে এই নিভৃত নিলয় দারুণ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করে' কবি লোকারণ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। কয়েক দিন সভা-সমিতির তাড়নায় ঝালাপালা হয়ে' শেষে গ্রামে প্রচারের কাজে বেরিয়ে পড়লেন।

কবির অন্তর্য্যামী সেদিনও হাসছিলেন।—চরকা যে কি অপূর্ব্ব আবিষ্কার কি বিরাট তপস্যার ফল, মহাত্মার অসহ-যোগ ভারতের ভাগ্যবিধাতার যে কি প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ, এর চাইতে দশগুণ জোরালো কণ্ঠ হলেও সে-সব সেদিন বলে' কবির তৃপ্তি হতো না।

কিন্তু কয়দিন। গ্রামবাসীদের জড়তার পরিমাণ তিনি কিছু উপলব্ধি করতে পারছিলেন। তার জন্য তাঁর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হচ্ছিল। তবু শেষে অধীর হয়ে তিনি দেখলেন, শুধু তাঁর খাতিরে কেউ কেউ চরকায় দুটো একটা পাক দেয়; হেসে বলে, "এ মেয়েলোকের কাজ কিনা।"

কংগ্রেস থেকে নাম কাটানোর দরখাস্ত পাঠিয়ে ছিন্নসূত্র ঘুঁড়ির মতো ধুঁকতে ধুঁকতে কবি মাদ্রাজ প্রদেশের এক

সমুদ্রতীরে বাসস্থান ঠিক করলেন। সমুদ্রের বিস্তারে তাঁর চিত্তবিক্ষেপ লুটিয়ে পড়ে' কেমন সহনক্ষম ছন্দে আত্মপ্রকাশ করলে।

আপনা আপনি শান্ত হয়ে' কবি ধ্যানাসনে বস্‌লেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস্ কেটে যেতে লাগলো। শেষে বৎসর কেটে যাবার উপক্রম করলে। ধ্যানের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রতলে কবি নিমজ্জিত।

প্রভাতের নিলিমাপ্রান্ত রঞ্জিত করে' অরুণোদয়ের যে রোমাঞ্চ একদিন তেম্‌নি রোমাঞ্চে কবির ভিতর বাহির সচকিত হলো। কবি পুলকিত হয়ে দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করলেন!

তার পরের যে প্রতীক্ষা, সন্দেহে আনন্দে নৈরাশ্যে তা বিচিত্র!—কবির ভাগ্যবিধাতার আশীর্ব্বাদের দৃষ্টি তাঁর উপর নিপতিত হলো। সন্তানবতী নারীর ন্যায় কবি অনুভব করলেন, তাঁর অন্তরে এক আবির্ভাব ঘটেছে।

তার পর সে আবির্ভাবের জগতের নেত্রে সুপ্রকট হবার পর্য্যায়। কবি বুঝতে পারলেন, বৃক্ষের ফল প্রসবের মতো, নারীর সন্তানবতী হবার মতো, জগতের করে তাপসের তপস্যা উপহার কি নিদারুণ পারম্পর্য্য-শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ! সে বন্ধন কি আয়াসের! কি প্রাণারামের!—কবি আবার ধ্যানরাজ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

সৃষ্টির কথা

তারপর মুখে আনন্দদীপ্তি চোখে আবেশ নিয়ে তিনি লিখতে বসলেন। দিন রাত কি ত্রস্ত গতিতে কালসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যেতে লাগলো, কে সেদিকে তাকায়। কবি লিখচেনই। লিখতে লিখতে তাঁর চোখের আবেশ কেটে গেল। সেই আবেশের স্থানে জাগলো পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি; আনন্দবিহ্বলতা পর্য্যবসিত হলো স্থির প্রসন্নতায়।—কবির মানসনয়নে আবির্ভূত হলো এক দিব্য মূর্ত্তি!

এর নবীনতায়, জ্যোতির্ম্ময়তায়, বীর্য্যবত্তায়, কবি আনন্দিত হলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর সমস্ত মানসবিপর্য্যয়ের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে এরই আবির্ভাব কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে স্পন্দিত হয়েছে!

পরম বেদনা ও আনন্দের দৃষ্টিতে এর সর্ব্বাঙ্গ তিনি অভিনন্দিত করলেন।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

সম্মোহিত মুসলমান

সম্মোহিত মুসলমান

হজরত মোহম্মদ যে একজন মহাপুরুষ, অর্থাৎ, সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেননি তা তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে এক আশ্চর্য্য-দৃঢ় রূপ লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে তর্ক বিচার করবার কাল বোধ হয় উত্তীর্ণ হয়ে' গেছে। এখনো যাঁরা তাঁর মাহাত্ম্যের পানে সন্দিগ্ধ চিত্তে তাকান, কেননা তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, অথবা শেষ বয়সে বহু বিবাহ করেছিলেন, বলা যেতে পারে, কিছু সরল প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা তাঁর জীবনের জটিলতাবর্ত্তে ঘুরপাক খেয়ে মরচেন। হয়তো তাঁদের সংস্কার আছে, মহাপুরুষের যে জীবন, শিশুর মতো সারল্যই তাতে প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক ও শোভন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, তাঁদের এ সংস্কার শুধু এক মধুর খেয়াল—সত্যের প্রতিষ্ঠা নয়। মহাপুরুষের জীবনে কেমন-এক ঋজুতা আমরা প্রত্যক্ষ করি সত্য, আসলে কিন্তু সেটি ঋজুতা নয়, ঋজুতার ভঙ্গিমা মাত্র। বহুভঙ্গিমতা বা মানবমনেরজটিলতা মহাপুরুষের জীবনে নিরাকৃত হয়ে' যায় না; সে-সমস্ত শুধু এক পরমাশ্চর্য্য অধিকারে একমুখিত্ব লাভ করে।

কিন্তু মহাপুরুষ মোহম্মদের অভক্ত যে তাঁর জীবনের এই জটিলতায় বিড়ম্বিত হয়েছেন সে আর কতটুকু দুঃখের বিষয়। তার চাইতে অনেক বেশী শোচনীয় ব্যাপার তাঁর অনুবর্ত্তী

ভক্তদের ভিতরেই ঘটেছে,—তাঁরাও তাঁর এই বিচিত্র অথচ ভগবন্মুখী জীবনে বিভূষিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহাসাধনাকে বিড়ম্বিত করেছেন।—তাঁরা তাঁর পানে যে-দৃষ্টিতে চেয়েছেন ও যে-দৃষ্টিতে চাইবার জন্য অপরকে আহ্বান করেছেন, তাতে এই সহজ অথচ অতি বড় সত্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, জগতের অনন্তকোটী মানুষের মতো হজরত মোহম্মদও একজন মানুষ;—মানুষের ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে শক্তিমাহাত্ম্যে তিনি সুপ্রকট, কিন্তু তাঁর শক্তিমাহাত্ম্য লাভই সে ইতিহাসের চরম কথা নয়, তার চাইতে গভীরতর কথা এই,—জগৎসংসারের যিনি চিরজাগ্রত নিয়ামক অনন্ত কাল ধরে তিনি এমনিভাবে শক্তিমান আর সাধারণ এই দুই শ্রেণীর চক্রের সমবায়ে সংসার-রথকে চিরচলন্ত রেখেছেন। বাস্তবিক, মহাপুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্ব্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবনসংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ; তাঁর কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে' দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহ্‌র উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে' যায়—যে আল্লাহ্‌ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত; হজরত মোহম্মদের অনুবর্ত্তীরা সেই প্রাণপ্রদ সদাস্মর্ত্তব্য কথা অদ্ভুত ভাবেই মন থেকে দূর করে'

দিয়েছেন ;—হয়ত তারই ফলে অন্যান্য ছোটখাটো প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেলেও "প্রেরিতত্ব"রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে তাঁরা যে জীবন পাত করছেন, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা সাংসারিকতা সব দিক থেকেই তা শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।

অথচ হজরত মোহম্মদের সাধনার এই বিড়ম্বনা ভোগ কত বিস্ময়কর ব্যাপার! মানুষের সাষ্টাঙ্গ প্রণামকে পর্য্যন্ত এই মহাপুরুষ গ্রহণ করেন নাই! আর তাঁর আবিষ্কৃত যে বজ্রসার তৌহীদ (একেশ্বরতত্ত্ব), তাঁর অবলম্বিত যে আশ্চর্য্য অনাড়ম্বর সাংসারিক জীবন, আগ্নেয় সাম্যবাদ, আল্লাহ্‌র পানে সে-সমস্তের যে প্রচণ্ড আকর্ষণ, কিসের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে!—কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য যত বড়ই হোক, এ কথা অস্বীকার করবার কিছুমাত্র উপায় নাই যে, সেই আল্লাহ্‌র উপলব্ধি, অন্য কথায়, সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রেম ও কল্যাণের যোগের উপলব্ধি, আজ তাঁর অনুবর্ত্তীদের দৃষ্টির সামনে নাই।—জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝেনা। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জগতের পানে সে তাকায় শুধু সন্দিগ্ধ আর অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে,—এর কোলে যেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, একে যেন সে চেনে না। কেমন এক অস্বস্তিকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সারা জীবন সে ভীত ত্রস্ত হয়ে' চলেছে!

মুসলমানের, বিশেষ করে' আধুনিক মুসলমানের, এই অবস্থা

লক্ষ্য করেই বলতে চাই—সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌত্তলিক নয়; সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে,—তার মানবসুলভ সমস্ত বিচারবুদ্ধি, সমস্ত মানস উৎকর্ষ, আশ্চর্য্যভাবে স্তম্ভিত! বর্ত্তমান তার জন্য কুয়াসাচ্ছন্ন, দিগ্‌দেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নাই। সময় সময় দেখা যায় বটে সে তার অতীতকালের বীরদের, রাজাদের, ত্যাগীদের, মনীষীদের কথা বলচে। কিন্তু এ শেখানো বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশী কিছু নয়। জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছ্রিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নাই। হজরত ওমর ও ইব্‌নে জুবেরের মতো বীর-কর্ম্মীদের, সাদী-ওমরখাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালি-রুমির মতো সাধকদের, জীবনের অন্তস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম—পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক নয়; শাস্ত্র বচনের পিছনে যে সত্য- ও শ্রেয়ঃ-অন্বেষী মানবচিত্তের স্পন্দনের অপূর্ব্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত

সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম—স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম। সেই প্রভুর হুকুমে কখনো কখনো ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন সে দেখে—কখনো 'প্যান ইসলাম'-এর স্বপ্ন, কখনো এই তের শত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্ত্তমান পরিবেষ্টন, যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে সেই তের শত বৎসরের আগেকার 'শরীয়ত'-এর হুবহু প্রবর্ত্তনার স্বপ্ন। কত নিদারুণ তার জীবনের পক্ষে এই প্রভুর হুকুম তার প্রমাণ এইখানে যে, এর সাম্‌নে তার সমস্ত বুদ্ধি বিচার স্নেহ প্রেম শুভইচ্ছা, সমস্ত স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব, আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হয়ে যায়, সে যে চিরদাস, চিরঅসহায়, অত্যন্ত অপূর্ণাঙ্গ মানুষ, এই পরম বেদনাদায়ক সত্য ভিন্ন আর কিছুই তার ভিতরে দেখবার থাকে না।

কিন্তু এই সম্মোহন আজ যত প্রবল চেহারা নিয়েই দাঁড়াক, অনুসন্ধান করলে বুঝতে পারা যাবে, এ নূতনই নয়,—পুরাতনও বটে।• মনে হয়, এ সম্মোহনের এক বড় কারণ হজরত মোহম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়, প্রেমে, কর্ম্মে, বিচিত্র ও বিরাট; নানা দুঃখ-দহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর তার ঔজ্জ্বল্য; তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক; কিন্তু হজরত মোহম্মদের ব্যক্তিত্বের এই প্রাখর্য্যের জন্যই হয়ত মুসলমান ইতিহাসের অনেক

শক্তিধর পুরুষও তার সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেন নাই।—হজরত ওমর ও ইমাম গাজ্জালির কথা বলতে চাই। হজরত ওমরের ভিতরে দেখা যায়, তিনি তাঁর প্রকাণ্ড পৌরুষকে যেন আর সব দিকে লৌহ-আবেষ্টনে বদ্ধ করে শুধু হজরত মোহম্মদের অনুবর্ত্তিতার পানে উন্মুখ রেখেছিলেন; সত্য আর হজরত মোহম্মদের সাধনা এক ও অভিন্ন এই-ই যেন তাঁর মনোভাব। তাঁর নিজের জীবন-সাধনার জন্য এই একান্ত অনুবর্ত্তিতার প্রয়োজন সব-চাইতে বেশী ছিল কিনা সে জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কেননা মুসলমান জগতের সামনে মাত্র একজন বিশিষ্ট সাধক তিনি নন, তার চাইতে সাধারণতঃ তাঁর সমাদর এইজন্য যে, সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের জন্য তিনি এক অতি বড় আদর্শ। ইমাম গাজ্জালিকেও তেমনিভাবে দেখা যায় দর্শনচর্চ্চার বিরুদ্ধে এই অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করেছেন:—সাপুড়ে তার অল্পবয়স্ক পুত্রের সামনে সাপ খেলায় না, তার ভয় এই, সে তার বাপের অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদ ঘটাবে; 'সর্ব্বসাধারণের জন্য দর্শনচর্চ্চাও এমনি ভাবে বিপজ্জনক'।*—সর্ব্বসাধারণের জন্য শাস্ত্রানুগত্যেও যে বিপদ কিছুমাত্র কম নয়, তাতে তাদের সত্যানুসন্ধিৎসায় গ্লানি পৌঁছবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, নিজে দার্শনিক আর সাধক হয়েও সে দিকে যে তিনি দৃষ্টি রাখেন নাই তার স্বপক্ষে এই সামান্য কথা বলা যেতে পারে যে, তাঁর যুগে এ প্রতিবাদের হয়ত প্রয়োজন হয়েছিল,—

* Confessions of Al Ghazzali নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বৃথাতর্কের প্রবণতা ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যান্বেষীকে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হজরত মোহম্মদের মহাদৃষ্টান্তের। তবু গোটা দর্শনচর্চ্চার বিরুদ্ধে তার যে প্রতিবাদ তাকে অত্যন্ত দোষাবহ বলা ভিন্ন উপায় নাই। যুক্তি বিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্ব্বানুবর্ত্তিতা পাষাণভারের মতনই মানুষের জীবনের উপর চেপে বসে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার সমস্ত চিন্তা- ও কর্ম্ম-প্রবাহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে' আসে।—কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ মানুষের প্রকৃতি চায়,—এই-ই তার জন্য কল্যাণকর; আর এই কর্ম্মচেষ্টার জীবনে পূর্ব্বানুবর্ত্তিতা যে মানুষের পরম কাঙ্ক্ষিত কে না তা জানে। তবু মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বহুধা সার্থকতার কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কর্ম্মের আয়োজন যেখানে মানুষ করে সেখানে সে যে মরণের আয়োজনই করে চিন্তাশীলেরা একথা আজ বিশ্বাস করেন।

ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। হজরত মোহম্মদের সংযমের সাধনা তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই আরবের আদিম উচ্ছৃঙ্খলতার ও পারস্যের বিলাস-মত্ততার আবর্ত্তে পড়ে' বিপর্যায় ভোগ করেছিল। সে বিপর্য্যয় সাম্‌লে নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করবার অবসর খুব কমই তার ঘটেছে। হয়ত সেই জন্যও কিছু বাড়াবাড়ির ছবি মুসলমান-ইতিহাসের প্রায় সব পর্য্যায়েই

আমাদের চোখে পড়ে—কখনো চরম উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি, কখনো অন্ধ অনুবর্ত্তিতার বাড়াবাড়ি। তবু, হজরত মোহম্মদের সাধনার পথে উদার বিচার বুদ্ধি নিয়ে সহজ ছন্দে বেড়ে উঠ্‌লে মানুষের জীবনে যে কি অলৌকিক মহিমা প্রকাশ পায়, সৌভাগ্য-বশতঃ তার দৃষ্টান্তও মুসলমান-ইতিহাসে খুব বিরল নয়। মুসলমান সমাজ নূতন করে' তাঁদের মাহাত্ম্যের কাহিনী পাঠ করবে যেন তারই অপেক্ষায় বিশ্বজগতে সৌরভ ছড়িয়ে অথচ নিজেদের ঘরে কতকটা অবহেলিত হয়ে নীরব মহিমায় তাঁরা বিরাজ করছেন। বিশ্ববরেণ্য শেখ সাদী এই পুণ্যশ্লোক মুসলমানদের অন্যতম। তাঁর যে সমস্ত অনাড়ম্বর অথচ প্রাণ- ও বিশ্বাস-সঞ্চারী বাণী হজরত মোহম্মদের তৌহীদ ও বিশ্ব-কল্যাণের সাধনাই সে-সমস্তের অন্তরে অন্তরে। কিন্তু হজরত মোহম্মদের সেই সাধনাকে তিনি গ্রহণ করেছেন ভয়বিহ্বল হয়ে নয়, অন্ধ অনুবর্ত্তিতার পথেও নয়,—সবল মনুষ্য প্রকৃতি ও উদার বিচার বুদ্ধির পথে। মনীষী তিনি, সত্যদ্রষ্টা তিনি, মানুষকে তিনি দেখেছেন জাতি-ধর্ম্মের, আচার-আড়ম্বরের সমস্ত আবরণ ভেদ করে, সেই মুক্ত অবিচলিত দৃষ্টিতেই তিনি চেয়েছেন হজরত মোহম্মদের পানে; দেখেছেন, মানুষের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার, বেদনা-সম্ভাবনার, কি আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য-সাধন সে জীবনে ঘটেছে, সেই জন্য তা কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল, কি বজ্ররোধী দৃঢ়তা তার অঙ্গে অঙ্গে—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তা মানুষের কত অবলম্বনযোগ্য! আবার যদি জ্ঞানে ও

মনুষ্যত্বে বিকশিত হয়ে জগতের কাজে লাগ্‌বার আকাঙ্ক্ষা মুসলমানের অন্তরে জাগে তখন এই মহামনীষী সাদী হবেন তাঁদের একজন শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জ্জন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়া যে তাঁরও প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে, প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায়, এবং সেই অধিকারে, প্রয়োজন হলে, তাকে অতিক্রম করায়, সেই তত্ত্বের সন্ধান যাঁদের কাছ থেকে নব মুসলিমের লাভ হবে এই শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাদী হবেন তাঁদের অন্যতম। *

জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নাই। বরং ইস্‌লামের যে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্য্যবন্ত সাধনা, জগতের জন্য আজো সেই সমস্তেরই দারুণতম প্রয়োজন। কিন্তু এই কল্যাণময় ইসলামকে বহন করে' জগতের আর্ত্ত ক্লিষ্ট নরনারীর সেবায় পৌঁছে দেবে কে? নিশ্চয়ই সেটি সেই কৃপার পাত্রের দ্বারা সম্ভবপর নয় যে "আলেম" বলে' নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার যার সাংঘাতিক ভাবে বদ্ধ! শত শত বৎসরের পুরাতন বিধি-

---

* সাদীর একটি অতি প্রসিদ্ধ বাণী এই :—"তরিকত বজুজ খেদমতে খল্‌ক্ নিস্‌ত্‌ বতসবিহো সুজ্জাদাও দল্‌ক্‌ নিস্‌ত্‌"। সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছু নয়। তসবিহ্‌ জায়নামজ ও আলখাল্লায় ধর্ম্ম নাই। বোধ হয় এই বাণীটিই রাজা রামমোহন রায়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত রামমোহনের জীবনী ৫২৪ পৃষ্ঠা (চতুর্থ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

নিষেধের তুচ্ছ তালিকা থেকে চোখ উঠিয়ে আল্লাহ্‌র এই জীবন্ত সৃষ্টির অন্তহীন সুখ দুঃখ ব্যথার পানে এতটুকু প্রীতি ও সমবেদনার দৃষ্টিতে চাইতে যে অপারগ !—কোনো সাধনার উত্তরাধিকার বংশসূত্রে নির্ণীত হয় না, গতানুগতিক শিষ্যত্ব-সূত্রেও নির্ণীত হয় না, হয় সাধনা-সূত্রেই। সাধক যে, নিজের রসনা দিয়ে সত্যের অমৃতস্বাদ গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা যাঁর চিত্তে জাগে, তাঁরই চোখে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীর সাধনার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, আর যে বেদনায় ও শ্রদ্ধায় সেই সাধনাকে বহন করে' নব নব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করে' তাকে সার্থকতা দান করতে হয়, সেই পরম সৌভাগ্যে অধিকারও তাঁর জন্মে। সেই সাধনার দ্বারা শক্তি ও যোগ্যতা অর্জ্জনের কথা বিস্মৃত হয়ে মুসলমান হজরত মোহম্মদের বিরাট তপস্যাকে বহন করতে গিয়েছিল শুধু অন্ধ অনুবর্ত্তিতার লাঠিতে ভর দিয়ে ! সে যে পিষ্ট পর্য্যুদস্ত হবে, তার মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হবে, এ তার অপরিহার্য্য পরিণাম। সেই তপস্যাহীন, সুতরাং অর্দ্ধবিকশিত মানুষ, মুসলমানই জগতের দুঃখ-ব্যাধিতে ইসলামের সেবা পৌঁছে দিতে হাত বাড়াতে পারবে, এ মোহ যে আজো আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের নেতাদের অন্তরে প্রবল, একটা গৌরবময়-অতীতের-অধিকারী সম্প্রদায়ের পক্ষে এর বাড়া লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে ?—আল্লাহ্‌র এ জগৎ বিরাট, অনাদ্যনন্ত হর্ষে ক্ষোভে, ব্যথায় আনন্দে, এ বিচিত্র, এই বিরাট, বাস্তবতার

সঙ্গে যে যোগযুক্ত নয় জীবনে শ্রেয়োলাভের আসল দরজা তার জন্য বন্ধ,—নূতন করে' এই সত্য আমাদের চিত্তে প্রেরণা সঞ্চার করুক; আমাদের দেহকোষাণুসমূহ অক্সিজেন সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্ত্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হয়, এমনি করেই দেহ সবল ও কার্য্যক্ষম থাকে, আমাদের চিত্তকেও তেমনি-ভাবে নব নব জ্ঞান ও প্রেরণার দহনে নিরন্তর দগ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে হয়, নইলে জড়তার আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে তা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য ও জীবনের পক্ষে অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়,—নূতন করে এ জ্ঞানের দহনে আমাদের সমস্ত জড়তা ভস্মীভূত হয়ে যাক; আর আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নাই,—জগৎ যেমন এক স্থানে বসে' নাই মানুষও তেমনি তার পরিবর্ত্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নাই—আর এই পরিবর্ত্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে' যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্ত্তিতার নয়, সদাজাগ্রতচিত্ততার।—হয়ত তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে। তখন জগতের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের পর্য্যায়ের অবসান হবে। তখন হয়ত সহজ দৃষ্টিতেই আমরা দেখতে পারব, বিপুলা এ পৃথ্বীর কত বিচিত্র প্রয়োজনে কত ধর্ম্ম কত নীতি কত সভ্যতা কোন্ অনাদি কাল থেকে তার কোলে জন্ম-লাভ করে আসছে,—আর এই অনন্ত জন্মপ্রবাহে ইসলামের অর্থ কি, তার নব নব সম্ভাবনা ও সার্থকতা কোন্ পথে। তখন

প্রীতিতে আর শ্রদ্ধায়ই আমরা অবলোকন করতে পারব, আমাদের প্রিয় হজরত মোহম্মদের সাধনার সঙ্গে যে সমস্ত মহাপুরুষের সাধনার হুবহু মিল নাই তাঁরাও কেমন করে' জগতের সেবা করে' চলেছেন। আর, নিন্দা ও বহ্বাড়ম্বরের স্থূলতা ভেদ করে' সত্যের চির-অমল চির-আনন্দপ্রদ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার যে গৌরব ও অমোঘ কার্য্যকারিতা, তখন জগৎ ও ইসলামের জন্য সেই শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সন্ধানে আমাদের চিত্ত উন্মুখ হবে।

মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছুমাত্র বিরোধ নাই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহীদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ,—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহ্‌কে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান, অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা, প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্য ভাবে বিকশিত হয়ে উঠ্‌তে পারে। তাছাড়া, ইসলামের তৌহীদের সাধনা জগতে কল্যাণ ও মুক্তির সহায়তা করে' এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। তৌহীদে-বিশ্বাসী দার্শনিক ইবনে রোশ্‌দের (Averroes) লেখা থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় চিত্তে শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় সন্দেহ জন্মেছিল, প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে বুদ্ধির এই মুক্তির স্থান ইয়োরোপীয় রিনেসাঁসে অনেকখানি; মধ্যযুগের ঘোর তামসিকতার ভিতরে নানক কবীর প্রভৃতি ভক্ত সত্যকার আধ্যাত্মিকতার দীপ ভারতে পুনঃ প্রজ্বলিত

করেছিলেন, তাঁদের সামনেও শিখারূপে জ্বলেছিল ইসলামের তৌহীদ ও সাম্যবাদ; আর বাঙালী মুসলমানের জন্য সব চাইতে বড় সুসংবাদ এই যে, ভারতের নবজাগরণের যিনি আদি নেতা সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের উপর ইসলাম আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্যকরী হয়েছিল। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের অবরুদ্ধতা ও নিরুদ্বেগের ভিতরে তিনি যে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন সবল কাণ্ডজ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম্মের বিশ্বধারা, সে সমস্তের যোগ্য প্রেরণা চিত্তবিকাশের মহামুহূর্ত্তে তাঁর লাভ হয়েছিল হজরত মোহম্মদের সাধনা থেকে,—তাঁর প্রচারিত তৌহীদ, সাম্য, নরনারীনির্ব্বিশেষে সবারই জীবনের মর্য্যাদা-বোধ, আধুনিক যুগের এই মহাপুরুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথে অমূল্য পাথেয়েরই কার্য্য করেছিল।

কিন্তু, 'চেরাগকে নীচে আন্ধেরা!'—সেই ইসলামের অনুবর্ত্তী বলে' আজ যারা নিজেদের পরিচয় দেয়, সমস্ত রকমের মুক্তির সঙ্গে তারা অপরিচিত!—কেন এমন হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের নতুন কোনো কথা বলবার নাই। সত্য ও সত্যসাধকের মহৈশ্বর্য্যময় প্রকাশের সামনে মুসলমান চকিত সম্মোহিত হয়েছে, জগতের সমস্ত সাধনাকে জীবনগঠনের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যে মানুষের চিরন্তন অধিকার, সে কথা সে শোচনীয়রূপে বিস্মৃত হয়েছে—বার বার এই কথাটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে;—একটা বড় সম্প্রদায় হিসাবে এই-ই মুসল-

মানের চরম দুর্ভাগ্য যে, তার যে সমস্ত পরমাত্মীয় পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য-প্রকৃতি নিয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও গভীর আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ইসলাম ও হজরত মোহম্মদের পানে চেয়েছেন, তাঁদের শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টান্তের চাইতে, যাঁরা ইসলাম ও হজরত মোহম্মদের দীপ্তিতে অন্ধ হ'য়ে সম্মোহিত হ'য়ে আস্ফালন করেছেন তাঁদের প্রচণ্ডতা, তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশী,—আর আজ পর্য্যন্ত সেই আকর্ষণই তার উপর প্রবলতম!

—তবে, শুধু নৈরাশ্যে একান্ত ম্রিয়মাণ না হলেও আধুনিক মুসলিম সাধকদের চলে। একটা বড় সত্যসাধনার পূর্ণ পরিস্ফুরণের জন্য তের শত বৎসর খুব দীর্ঘকাল নয়। বিপুল ভবিষ্যৎ তাঁদের সামনে। সেই ভবিষ্যতে ভীত সম্মোহিত মুসলমানের পরিবর্ত্তে মুক্তদৃষ্টি ভূমার প্রেমিক মুসলমানকে জগৎ পাবে, তাতে করে' বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের চিরসংগ্রামে এক দৃঢ়মেরুদণ্ড-সমন্বিত অকুতোভয় সৈনিক জগতের লাভ হবে, ইসলামও এক অপূর্ব্ব সার্থকতার শ্রীতে মণ্ডিত হবে—এই আশায় ও বিশ্বাসে তাঁরা তাঁদের অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত ব্যর্থতা ও লজ্জা বহন করতে পারেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

সমাপ্ত

কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ।

১। রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রপ্রতিভার আলোচনা) ১৲

২। নদীবক্ষে (উপন্যাস) ১৷৹

৩। মীর-পরিবার ও অন্যান্য গল্প ১৷৹